# সংবিধান ও বিচার বিভাগের ৪০ বছর

ল' রিপোর্টার্স ফোরাম
মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দায়বদ্ধ

# সংবিধান ও বিচার বিভাগের ৪০ বছর

**প্রকাশনা :**
**ল' রিপোর্টার্স ফোরাম**
**১১৭, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি এনেক্স ভবন (নীচতলা)**

**সম্পাদনা পরিষদঃ**
**শহীদুজ্জামান**
**সালেহউদ্দিন**
**মাশহুদুল হক**
**ইলিয়াস হোসেন**
**সাজেদুল হক**

**প্রকাশকালঃ**
**মার্চ ২০১৩**

**শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদঃ**
**আজহার ফরহাদ**

**গ্রাফিক্স ও পৃষ্ঠাসজ্জাঃ**
**মোঃ সাকিল সরকার**

**মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা :**
**নন্দিত, ১০০-১১৯ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)**
**শাহবাগ ঢাকা ১০০০**
**ফোন : ৯৬৬০৯৭২, মোবাইল : ০১৭১১-০৫ ৩৩ ২৫**
**মূল্য : পাঁচ শত টাকা মাত্র**

www.pathagar.com

# সম্পাদনা পরিষদের কথা

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের সংবিধানের ৪০ বছর পূর্তি হয়েছে। স্বাধীনতার পর পর দেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলেও, সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে সুপ্রিম কোর্ট কাজ শুরু করে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় ১৯৭২ সালের সংবিধানের আওতায়। সেই হিসেব গণনায় ধরে আমরা উদ্যোগ নিই 'সংবিধান ও বিচার বিভাগের ৪০ বছর' শীর্ষক এই গ্রন্থ প্রকাশের।

লাখো শহীদের রক্ত এবং মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা যেমন একটি স্বাধীন দেশ পাই, তেমনি পাই একটি সংবিধান। দেশ স্বাধীনের মাত্র এক বছরের মধ্যে এরকম একটি গণতান্ত্রিক এবং অগ্রসরমান সংবিধান করতে পারা সত্যি চ্যালেঞ্জের। সেই চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয় আমাদের সংবিধান। এখানে উল্লেখ যে, রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি ছাড়া ১৯৭২ সালের সংবিধান নিয়ে এখনো তেমন কোন বিতর্ক নেই।

ড. কামাল হোসেন এই সংখ্যায় লিখেছেন কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবিধান প্রণীত হলো। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সহযোগী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণাপত্র লেখার কথা। ঐতিহাসিক এই দলিল প্রণয়ন ও মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের দিনের বর্ণ না পাওয়া যাবে তার লেখায়। আমাদের শিরোনামের সাথে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে আবারও সংবিধানের কথা' শীর্ষক লেখাটির মিল খুঁজে পাই। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখাটি পুনঃমুদ্রণ করলাম।

বাহাত্তরের সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে গণপরিষদের কার্যক্রম এই গ্রন্থে সংযোজনের সিদ্ধান্ত আমরা নেই। সংসদ সদস্য ফজিলাতুন্নেছা বাপ্পীকে অনুরোধ করার পরই তিনি সংসদের গ্রন্থাগার থেকে গণপরিষদ বিতর্কের একটি কপি পাঠিয়ে দেন। ফজিলাতুন্নেছা বাপ্পীর প্রতি আমাদের


www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা। গণপরিষদ কার্যক্রম জানতে খোন্দকার আবদুল হকের লেখা 'সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি' বইটিও যথেষ্ট উপকার দিয়েছে।

আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের দুটি লেখা ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি লেখা আমরা প্রথম আলোকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুনঃমুদ্রণ করলাম। এই দুটি লেখা গ্রন্থের উদ্দেশ্যকে সমৃদ্ধ করবে।

তরুণ আইনজীবী ও পেশাজীবীদের জীবনযুদ্ধের সংগ্রামকে আরো অনুপ্রাণিত করতে আমরা বিশিষ্ট কয়েকজনের জীবন সংগ্রামের কথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের আত্মজীবনী 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা' বই থেকে আমরা একটি লেখা নিয়েছি। এই লেখায় রয়েছে একজন আইনজীবী হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সরল স্বীকারোক্তি। এম এ-তে মাত্র তিন নম্বর কম পাওয়ায় তাঁকে বাধ্য হয়ে আইনজীবীর পেশা বেছে নিতে হয়েছিল। এই লেখা পড়ে তরুণ প্রজন্মের যে কোনো পেশাজীবী নিঃসন্দেহে উদ্দীপ্ত হবেন।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম আইনজীবী, সাবেক মন্ত্রী, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডার সাবেক বিচারক বিচারপতি টিএইচ খান আইন পেশায় ৬২ বছর, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আইন পেশায় ৫৩ বছর, কোম্পানি আইন বিশেষজ্ঞ ড. এম জহির আইন পেশায় ৫১ বছর, সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আইন পেশায় ৪৬ বছর এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আইন পেশায় প্রায় ৪০ বছর সময় পার করেছেন। তাদের বর্ণাঢ্য পেশা ও কর্মজীবন নিয়ে রয়েছে স্মৃতিচারণ। আইনজীবী হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা আমরা জানতে পারব এসব লেখা পড়ে।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সংবিধান সংশোধনের ওপর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই লেখায় সংবিধানের ১৫টি সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশও রয়েছে।

উচ্চ আদালতে বাংলার ব্যবহার সম্পর্কে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক একটি লেখা দিয়েছেন। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত মাসদার হোসেন মামলার প্রেক্ষাপট ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল 'আমাদের সংবিধান কতটুকু জনস্বার্থমূলক' এ শিরোনামে একটি সমৃদ্ধ লেখা দিয়েছেন। সিনিয়র


www.pathagar.com

সাংবাদিক মিজানুর রহমান খানের একটি লেখা আছে 'খসড়া সংবিধানের পাঠ' শিরোনামে।

এই গ্রন্থে আমরা কয়েকজন প্রয়াত বরেণ্য আইনজীবীকেও স্মরণ করেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ও খ্যাতিমান ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক তাদের মধ্যে অন্যতম। অ্যাডভোকেট আনিসুল হক লিখেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পরিচালনায় তাঁর প্রয়াত পিতা অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের ভূমিকা নিয়ে। অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান এখনো পিতৃতুল্য সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে খোঁজেন, স্বপ্নের সারথী হয়ে যেন তিনি বাংলাদেশের ভ্যানগার্ড হয়ে ফিরে আসবেন।

পেশাদার রিপোর্টারদের জন্য একটি মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করা সত্যি অনেক কঠিন। নিজেদের কাজের ফাঁকে এর জন্য কাজ করতে হয়েছে- কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। এই গ্রন্থে ছাপা হওয়া লেখা ল' রিপোর্টার্স ফোরাম শুধু প্রকাশ করেছে। লেখাগুলো সংশ্লিষ্ট লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত। এসব লেখা ল' রিপোর্টার্স ফোরামের অবস্থানের প্রতিফলন নয়। এমনকি ফোরামের সভাপতি সালেহ উদ্দিনের 'সংবিধান নিয়ে বিতর্ক' লেখাটিও তার নিজস্ব মত।

বাংলাদেশের সংবিধান ও বিচার বিভাগ, অতীত ও বর্তমান নিয়ে প্রকাশিত এই গ্রন্থ এবং একাডেমিক আলোচনার অংশ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি। এই গ্রন্থ অনেক দিক থেকে হয়তো অপূর্ণতা থাকবে। কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না।

গ্রন্থটি প্রকাশে সহায়তার জন্য আমাদের প্রিয় সংগঠনের সম্মানিত সকল সদস্য, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্মানিত সকল সদস্য ও এই সংখ্যার সম্মানিত লেখকদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থে কিছু ভুল ত্রুটি রয়েছে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সফল ও সার্থক হবে।

শুভেচ্ছায়

• শহীদুজ্জামান • সালেহউদ্দিন • মাশহুদুল হক • ইলিয়াস হোসেন • সাজেদুল হক


www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে আবারও সংবিধানের কথা | | মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ০৬ |
| আমার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম | | লতিফুর রহমান ১৬ |
| উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে বাধা নেই | | এবিএম খায়রুল হক ৩১ |
| আমাদের সংবিধান একদম মেইড ইন বাংলাদেশ | | কামাল হোসেন ৩৫ |
| আইন পেশার ৪৬ বছরের শুরুটা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে | | মওদুদ আহমদ ৪০ |
| স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণাপত্র যেভাবে লিখলাম | | এম আমীর উল ইসলাম ৫০ |
| পেশার নেশায় কেটে গেছে তেপ্পান্ন বছর | | রফিক-উল হক ৬১ |
| আইন পেশায় শর্টকার্ট কোনো পথ নেই | | মাহবুবে আলম ৬৪ |
| A Genesis of Amendments to Constitution in Bangladesh | : | রোকনউদ্দিন মাহমুদ ৬৮ |
| সংবিধান যেভাবে বাংলায় হলো | : | আনিসুজ্জামান ৯০ |
| বাংলায় আইন রচনা | | কাজী এবাদুল হক ৯৩ |
| জীবন নিয়ে হিসেব মেলাতে চাই না | : | টি এইচ খান ৯৫ |
| কোম্পানি আইনের বইটি হবে আমার এপিটাফ | | এম জহির ৯৯ |
| আমাদের সংবিধান কতটুকু জনস্বার্থমূলক | | আসিফ নজরুল ১০৫ |
| বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ | : | মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্‌পু ১১২ |
| আমার পিতা সিরাজুল হক | : | আনিসুল হক ১২৯ |
| খসড়া সংবিধানের পাঠ | | মিজানুর রহমান খান ১৩৪ |
| সৈয়দ ইশতিয়াক ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান | | মোঃ আসাদুজ্জামান ১৩৯ |
| সংবিধান নিয়ে বিতর্ক | | সালেহউদ্দিন ১৪৫ |
| গণপরিষদ কার্যক্রম | | মাশহুদুল হক ১৬১ |
| সংবিধান সংক্রান্ত কয়েকটি রায় | | ২০০ |
| এলআরএফ-র কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক | | ২০৮ |




www.pathagar.com

# স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে আবারও সংবিধানের কথা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

২০০৩ সালের স্বাধীনতা দিবসে সংবিধানের কথা শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছিলাম বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিরূপে সংবিধানটির প্রাধান্য রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধানকে আমাদের পবিত্র কর্তব্য ভেবে সদা জাগ্রত হয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তির আগেই উচ্চ আদালতের আদেশে সংবিধানের পুনঃমুদ্রণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

সাধারণ লোক, আমজনতার সংবিধান নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। বরং খবরের কাগজের ছিঁটেফোটা শুনে ভাবতে পারে যে দেশের দলিলের লেখাজোখা নিয়ে সাহেবরা ফাঁপরে পড়েছে।

অদীক্ষিত মনে সংবিধান সম্পর্কে কীরকম মজার ধারণা থাকতে পারে ভিনদেশের একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৮২৫ সালে রুশ সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ছোট ভাই নিকোলাস বড় ভাই কন্‌স্‌তাইনকে ডিঙ্গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বড় ভাইয়ের সমর্থকরা কন্‌স্‌তানতাই ও কন্‌স্‌তুৎসিয়া এই ধ্বনি তুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী পক্ষের সাধারণ লোকের ধারণা হয় কন্‌স্‌তুৎসিয়া বোধ কন্‌স্‌তাইনের রাণী। আমাদের দেশের সাধারণ লোক বেশির ভাগ আনাড় হলেও এমন ধারণা তারা করবে না। কিন্তু সংবিধান নিয়ে এত যে কচ্চাল উঠেছে। আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ ৪১ ডি এল আর (এডি) (১৯৮৯) ১৬৫-র মামলায় সামরিক আমলে সংশোধনীকৃত অনুচ্ছেদ ১০০ কে অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর সংবিধান সংশোধন করে মুদ্রিত হয়। সে সময় একটি মাত্র অনুচ্ছেদের সংশোধন প্রয়োজন ছিল। সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে, আমাদের উচিত ছিল সংসদে সংবিধান সংশোধন এনে আপিল বিভাগের রায় কার্যকর করা। পৃথিবীতে ৭৭টি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রধর্মের বিধান রয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রধর্মের বিধান আবার মালয়েশিয়ার সংবিধান থেকে নিয়েছি। বছর বিশেক আগে মালয়েশিয়া আপিল আদালতের বিচারকদের এক সম্মেলনে


www.pathagar.com

আমি যোগ দিই। নৈশভোজের সময় আমার পাশে উপবিষ্ট বিচারক আমাকে বললেন, 'আমি দু ধরনের বিড়ম্বনাগ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তি। আমি খ্রিস্টান এবং আমি চীনা বংশোদ্ভূত। সকলের সঙ্গে সমান। চক্ষে আমাকে বিবেচনা করা হলে আমার অবস্থান অনেক ওপরে থাকতো। রাষ্ট্রের সব নাগরিক যদি রাষ্ট্রের কাছে সমান অধিকার না পায় এবং রাষ্ট্রের আদালতে সমান প্রতিকার পেতে অধিকারসম্পন্ন না হয় তবে সে রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পেতে পারে না। আইনের চোখে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সমান হলেও তাদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে– এমন অনৈতিক, অন্যায্য এবং অবোধগম্য রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্লেসি বনাম ফারগুসন (১৮৯৬) মামলায় দিয়েছিল। কেবল একজন বিচারক জাস্টিস হার লান বলেছিলেন 'সংবিধান রং-কানা'। যে কথা কারো কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। ওই বৎসর ব্রাউন বনাম বোর্ড অব এডুকেশানের মামলায় বর্ণবৈষম্যকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়। তারপর কৃষ্ণকায়দের সংগ্রাম শেষ হয়নি। ১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার জুনিয়রের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা 'আমার এক স্বপ্ন' প্রদানের পর কয়েক দশক কেটে যায়। অবশ্য সকল মানুষের স্বপ্ন আফ্রো-আমেরিকান বারাক হোসেন ওবামা প্রেসিডেন্ট হলে অশ্বেতকায়দের স্বপ্ন চরিতার্থ হলো জিয়াউর রহমান সমাজতন্ত্র বলতে অর্থাৎ বলে এক ব্যাখ্যা দেন। বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষ বলতে এক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। সংবিধানে আদর্শিক কথা যত কম থাকে তত ভালো। বর্তমান কাল ভবিষ্যতকে বেঁধে রাখতে পারে না। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের সমক্ষে সকলে সমান ও সমান আশ্রয় ও প্রতিকারের অধিকারী–এমন বিধান রেখে সর্বোচ্চ আদালতের রাষ্ট্রনায়কোচিত সদাবিবেচনার ওপর ভরসা করা মঙ্গলজনক।

আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির চল্লিশ বৎসর হতে চললেও গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। প্রশাসনে দক্ষ আমলার প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু দেশের কর্ণধাররা যখন আমলা-নির্ভর বা আমলা-উপদেষ্টার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে তখন সে দেশের কপাল মন্দ। আমলা ও আমলা-উপদেষ্টাদের 'কর্তার ইচ্ছাই কর্ম নীতি' অনুসরণ করা নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন দেশের জন্য মোটেই মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে না। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বেদাতের ঠেলাঠেলি। একেক পীর একেক কেরামতি। জেলাওয়ারি সংসদ থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্যের আধিপত্য বিস্তারের যেসব বেনোজল ঢুকে পড়েছে তা তো সমাজদেহে নানা ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি করবে।


www.pathagar.com

আইনমন্ত্রী সংবিধান মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলেছেন। কাট অ্যান্ড পেস্ট বা কাটো আর জোড়া দাও পদ্ধতির ডিলিট ইনসার্ট পদ্ধতির জন্য ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। আইনমন্ত্রীকে বেনেফিট অব দ্য ডাউট বা সন্দেহের খাতিরে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। তবে মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলে আবার প্রশ্নবিদ্ধ মুদ্রিত সংবিধানকে কিভাবে 'কার্যকর সংবিধান' বলা যায়। তা যে বলা যায় না তা সংবিধান সংশোধন কমিটি ভালোই বুঝেছেন। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য বলা হয়েছে মুদ্রিত সংবিধান খসড়া মাত্র।

যে আইন প্রণেতাদের গড়-হাজিরীর সংসদের ব্যয়বহুলভাবে বাধাগ্রস্ত এবং যারা স্বার্থের সংঘাতময় প্রশ্নেও সিলেক্ট কমিটিতে অংশগ্রহণ করেন তাদের আইনের গুণাগুণ বিবেচনার কোনো সময় নেই। আইন বিভাগের মুন্সিরা নির্বাচিত শাসকদের আমলে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নীতিতে যেসব মুসাবিদা করেছেন সেই একই খাসলতে ওই মুন্সিরাই সমান দক্ষতা ও আনুগত্যের সঙ্গে অনির্বাচিত শাসক সেবা করে এসেছেন। তারপর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ন্যূনতম জানাশোনা ও সমঝোতা না থাকলে গণতন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে তেমন বিদঘুটে অবস্থা চলে আসছে গত চল্লিশ বছর ধরেই।

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে ১১৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন। তিনি দাবি করেন, দেশে এখন সাংবিধানিক শূন্যতা চলছে। খসড়া, মুদ্রিত, নাকি বাহাত্তরের সংবিধান–কোনটি অনুসরণ করা হবে, তা কেউ জানে না। দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান এখন জগাখিচুড়ি অবস্থায় আছে।

খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত রায়ের আলোকে সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু মুদ্রিত সংবিধানে আপিল বিভাগের রায়কে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ওই রায় পাশ কাটিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শের বিধান না থাকায় বিচার বিভাগ প্রশাসনের অধীনে ফিরে গেছে। এতে করে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করার যে অর্জন, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের বিধান


www.pathagar.com

ছিল। মুদ্রিত সংবিধানে এখন তা নেই।

পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে আপিল বিভাগের রায় ও মাসদার হোসেন মামলার প্রসঙ্গ টেনে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, আপিল বিভাগের রায়ে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের বিষয়ে ১৯৭২ সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। কিন্তু এটা অবজ্ঞা করা হয়েছে। তবে আইন মন্ত্রণালয় থেকে সুপ্রিম কোর্টে পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়গুলো মতামতের জন্য পাঠানো হচ্ছে। সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করায় সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে ওইসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অধঃস্তন বিচারকদের পদায়ন, বদলি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো কার্যকর হচ্ছে না। এ নিয়ে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। মাসদার হোসেন মামলায় বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ১১৬ অনুচ্ছেদটি এখন পরিবর্তনের ফলে আগের অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধঃস্তন আদালতের বিচারকরা যাতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করতে পারেন, সেজন্য ১১৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করতে হবে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি পুনর্মুদ্রিত সংবিধান প্রকাশ করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুর) ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। এরপর সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা বিচার বিভাগ থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়। তবে পঞ্চম সংশোধনীর (আদালতের রায়ে অবৈধ ঘোষিত) মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে কিছুটা ভারসাম্য এনে নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষ রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে ১১৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করা সংক্রান্ত পঞ্চম সংশোধনীর অংশটুকু নেই। আদালত অনুচ্ছেদটিকে ১৯৭২-এর আদলে ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে দায়িত্বটি সংসদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সংবিধান সংক্রান্ত আপিল বিভাগের রায় রিভিউ বা পুনর্বিলোকনের আবেদন শুনানির জন্য অনুমতিদান করলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্পূর্ণ ব্যাপারটি পর্যালোচনা করার একটা সুযোগ পাবেন। শুনানির বিভিন্ন মতাবলম্বী আইনজীবীদের মধ্যে স্বল্পকয়েকজন আদালতের বন্ধু হিসেবে আহবান করা যেতে পারে। তবে সেই সংখ্যা সীমিত না থাকলে 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।


www.pathagar.com

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য গত ১৪ মার্চ ২০১১ রাষ্ট্রপক্ষ একটি আবেদন দায়ের করে। আপিল বিভাগের দেওয়া রায়ের দুটি বিষয় প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। একটি হচ্ছে– সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া রায়ে মুজিবনগর সরকার থেকে শুরু করে সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত সময়কে ক্রান্তিকাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আপিল বিভাগ এই সময়টাকে ক্রান্তিকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটাকে প্রত্যাহার করার জন্য রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে–আপিল বিভাগের রায়ে সামরিক শাসনের সময়ে জনকল্যাণমূলক কাজগুলোকে পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টিও প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়। ২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে '৭২ সালের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদ ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ এবং ১৪২ পুনর্বহাল করে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হয়। একই বছরের ২৭ জুলাই রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি প্রকাশিত হয়। পরে সেপ্টেম্বরে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মূল সংবিধানের আটটি অনুচ্ছেদসহ এ সংক্রান্ত কিছু বিষয় পুনর্বহালের কথা বলা হলেও আইন মন্ত্রণালয় প্রায় ৭০টি অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করেছে। এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আইনজ্ঞরা বলেছেন, সংসদের অনুমোদন ছাড়া সংবিধানের যে কোনো পরিবর্তন ও সংশোধন অবৈধ ও বেআইনি। সংবিধান সংশোধনে আইন মন্ত্রণালয়ের 'অযাচিত হস্তক্ষেপের ক্ষমতার উৎস কোথায়'–তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান পর্যন্ত সব সামরিক সরকারের ক্ষমতা দখল ও তাদের কার্যক্রমকে আইন ও সংবিধান বহির্ভূত ঘোষণা করা হয়। রায়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ ও ১৪২ অনুচ্ছেদের যেসব পরিবর্তন এ সময় সামরিক ফরমান দিয়ে করা হয়, সেগুলো ক্ষমার অযোগ্য ও বাতিল ঘোষণা করা হয়। রায়ে বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত দেশ চলেছে অবৈধ ও অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলকারীদের ইচ্ছা অনুযায়ী।

১৫ মার্চ ২০১১ অধিবেশনের শুরুতে বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া বলেন, অতীতে দেশে দলীয় শাসন ছিল। এখন সরকার চলছে একক ব্যক্তির শাসনে। তিনি বলেন, দেশে সাংবিধানিক সংকট চলছে। খসড়া


www.pathagar.com

সংবিধান দিয়ে দেশ চলতে পারে না। দেশে সংবিধান নেই। যে কোনো সময় দেশে যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। বর্তমানে দেশে আইনের শাসন নেই। প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে সংসদ ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিন।

দলের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে মুক্তি দিয়ে সংসদে যোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এরশাদ যখন জেলে ছিলেন, তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে সংসদে আনা হয়েছিল। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে সংসদে আসার সুযোগ দেওয়া হোক। তিনি বলেন, প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আমরাও চাই। কিন্তু যে ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক মানের নয়। এই ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধের বিচার হতে পারে না। ধরে নিয়ে নিজেদের মতো মামলা সাজিয়ে বিচার করা হবে, তা আমরা চাই না। যদি বিচার করতে হয়, তাহলে আপনাদের দলের ও আত্মীয়-স্বজনদেরও বিচার করুন। তাহলেই জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে।

আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ বলেছেন, পঞ্চম সংশোধনীর রায়ের আলোকে সংবিধান পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পুনর্মুদ্রিত সংবিধানই বর্তমানে কার্যকর থাকবে। একই দাবি করেছেন ৭২'র সংবিধান প্রণেতা কমিটির অন্যতম সদস্য এম আমীর-উল ইসলাম। তিনি বলেছেন, পুনর্মুদ্রিত সংবিধানকে কোনোভাবেই খসড়া সংবিধান বলা যাবে না। এটি দেশের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংবিধান। অন্যদিকে, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও কমিটির সদস্য সাবেক আইনমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু পুনর্মুদ্রিত সংবিধানকে খসড়া সংবিধান বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল মতিন খসরু বলেছেন, আমাদের (সংসদীয় বিশেষ কমিটি) কাছে সংবিধানের যে কপি দেওয়া হয়েছে সেটা খসড়া হিসেবে দেওয়া হয়েছে। সংসদ খুঁটিনাটি বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেবে, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেটাই কার্যকর সংবিধান অনুযায়ী গণ্য হবে। সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেছেন, আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীর মামলায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৮টি অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় আদালতের এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে ৫০টি অনুচ্ছেদ সংযোজন, সংশোধন ও পুনর্মুদ্রণ করেছে। তিনি বলেন, পুনর্মুদ্রিত সংবিধান আমাদের সংবিধান নয়।

সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করা হলেও তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। সংবিধান রক্ষণ,


www.pathagar.com

সমর্থন ও নিরাপত্তা রক্ষার শপথ যারা নিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের সেই বিচারকদের কাছেও মুদ্রিত সংবিধান নাকি পাঠানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেছেন, পুনর্মুদ্রিত সংবিধান অনেক ক্ষেত্রেই সংযোজন ও বিয়োজন হবে। তাই এটা বিতরণ করা হচ্ছে না। আইনমন্ত্রী একই সঙ্গে বলছেন, পুনর্মুদ্রিত সংবিধানই কার্যকর সংবিধান। আইনমন্ত্রী যদি পুনর্মুদ্রিত সংবিধানকে বভভবপঃরাব অর্থে কার্যকর বলে থাকেন, তবে তিনি যথার্থ বলেননি। তিনি যদি তা working paper বলতে চেয়েছেন, তা হলেও 'কার্যকর' শব্দের অযথার্থ প্রয়োগ হয়েছে। ইংলিশ কমন ল'য়ের অহঙ্কারে গর্বিত ব্যারিস্টারদের চেয়ে আমাদের স্বদেশে শিক্ষিত আইনজীবী 'খসড়া'র শাক দিয়ে যে মাছ ঢাকতে চেয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। working paper- এর বাংলা বের করতে আমি পাঁচটি অভিধান দেখেছি। জামিল চৌধুরীর শব্দ সংকেত-এ working paper-এর বাংলা কর্মপত্র আমার কাছে ভালোই মনে হলো।

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যেভাবে সংশোধিত হয়েছিল পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে সেভাবেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অর্থাৎ নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। ৭২ সালের মূল সংবিধানে এটি সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। ৫ম সংশোধনীতে (আদালতের রায়ে অবৈধ ঘোষিত) নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়। মুদ্রিত সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শের বিধানটি তুলে নেয়া হয়েছে। তবে আইনমন্ত্রী দাবি করেছেন, ১১৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত যে বিধান রয়েছে, তা ভুলক্রমে বাদ পড়েছে।

অন্যতম সংবিধান প্রণেতা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এম আমীর উল ইসলাম বলেন, উচ্চ আদালত তাদের রায়ের ৫ম সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ফলে সংবিধান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে। তবে যেগুলো আদালত মার্জনা করেছেন সেগুলো সংবিধানের অংশ। অসাংবিধানিক পন্থায় বা সামরিক ফরমানবলে যেসব সংশোধনী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা বাতিলের এখতিয়ার আপিল বিভাগের রয়েছে। সংবিধানে নতুন করে কোনো কিছু সংযোজনের এখতিয়ার আদালতের নেই। ১১৬ অনুচ্ছেদ ৫ম সংশোধনীর পূর্ব অবস্থায় বহাল থাকছে। তবে মাসদার হোসেন মামলা ও দশ বিচারকের মামলার


www.pathagar.com

রায়ের পর বিচারক নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সংবিধানে থাকুক বা না থাকুক এটি বাধ্যতামূলক রীতি-নীতিতে (কনভেনশন) পরিণত হয়েছে। চতুর্থ সংশোধনীর সাংবিধানিকতা নিয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি এবং আদালতও কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেননি।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেওয়া ৫ম সংশোধনীর রায়ের আলোকে আইন মন্ত্রণালয় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করে। এর মাধ্যমে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান, ১১৬ অনুচ্ছেদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আর রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি ছাড়া ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান ফিরে এসেছে। সংবিধানে ফিরে এসেছে চার মূল নীতি–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আওতাভুক্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস শব্দটি মূলনীতি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মূল সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ হুবহু পুনর্মুদ্রণ করায় ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক সমিতি বা সংঘ গঠন করার বা তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকবে না।

মূল সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ যেভাবে ফেরত এসেছে, তা হলো–'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোনো প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।'এই অনুচ্ছেদের ফলে ১৯৭২ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে সংবিধান পুনর্মুদ্রণ নিয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন তাদের বক্তব্যে–

তিনি মনে করেননি মুদ্রণের ভুলে ১১৬ অনুচ্ছেদ এভাবে ছাপা হয়েছে। মনে হয় জেনেশুনে এটা করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী যদি মুদ্রণ ভুল দেখতে পান এবং এ বিষয়ে যেহেতু একটি অভিযোগ এসেছে সেহেতু তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, 'পুনর্মুদ্রিত সংবিধান যা ১৪


www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি মুদ্রিত হয়েছে তাকে কোনোভাবেই খসড়া সংবিধান বলা যাবে না। এটি দেশের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংবিধান। এই সংবিধানকে কার্যকর সংবিধান ধরেই সংসদের এখতিয়ার রয়েছে তা সংশোধনের।'

সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ বলেন, 'পুনর্মুদ্রিত সংবিধানের কোনো ভিত্তি নেই। আপিল বিভাগ ৫ম সংশোধনী মামলায় ৭২'র ৮টি অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে উপেক্ষা করে ৫০টি অনুচ্ছেদ সংযোজন, সংশোধন ও পুনর্মুদ্রণ করেছে। এটা বেআইনি ও সংবিধান পরিপন্থি। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের উচিত আইন মন্ত্রণালয়কে তলব করা ও এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।'

যদি সরকার মনে করে, সংবিধান সংশোধন অত্যাবশ্যকীয়, সেক্ষেত্রে আমার সুনির্দিষ্ট মন্তব্য হলো, সরকার যদি অনেক দিনের জন্য সংশোধিত সংবিধান টিকিয়ে রাখতে চায়, তাহলে তারা যেন একটি সর্বদলীয় বিশেষ কমিটি গঠন করে। যেমন আমরা একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর সময় বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলাম। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মিলেমিশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে এসেছিল। সে ধরনের একটা সর্বদলীয় কমিটি করা হোক। এভাবে সমঝোতার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো যদি আনা সম্ভব হয়, তাহলে আমার মনে হয় সংবিধান অনেক টেকসই হবে।

সাবেক আইনমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু বলেছেন, আমাদের (সংসদীয় বিশেষ কমিটি) কাছে সংবিধানের যে কপি দেয়া হয়েছে, সেটা খসড়া হিসেবে দেয়া হয়েছে। আমরা এখন এর ওপর কাজ করছি। আমাদের যে সিদ্ধান্ত হবে, সেটা আমরা সংসদে উপস্থাপন করব। সংসদ খুঁটিনাটি বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেবে, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেটাই কার্যকর সংবিধান হিসেবে গণ্য হবে। সংবিধান সংশোধন, বিয়োজন, পরিবর্তন করার কোনো এখতিয়ার আইন মন্ত্রণালয়ের নেই। আইন মন্ত্রণালয় যে খসড়া সংবিধান আমাদের দিয়েছে, পঞ্চম সংশোধনীর মামলার আলোকে এখন আমরা তা খতিয়ে দেখছি। আপিল বিভাগের নির্দেশনার বাইরে তা যতটুকুই যাবে, ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে। সংসদই তার স্বীয় এখতিয়ারবলে সংবিধানের যে কোনো অনুচ্ছেদে পরিবর্তন বা সংশোধন আনতে পারে। সেটাই চূড়ান্ত হবে। তিনি বলেন, আমরা কতগুলো মৌলিক নীতিমালা গ্রহণ করেছি। প্রথমত, সাংবিধানিক উপায় ছাড়া অন্য কোনো পেশীশক্তি বা সামরিক আইন, ফরমান ইত্যাদি


www.pathagar.com

দ্বারা সংবিধাে ই করুক না কেন, তা আমরা বাতিল করব। তৃতীয়ত, আমাদের সংবিধানের মূল নীতি ও লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা, তার ভেতর আমরা থাকব। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। সব ধর্মের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব। ৩৮ অনুচ্ছেদের মূল কথা হলো ধর্মকে যাতে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে কেউ অপব্যবহার করতে না পারে, সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সংবিধানে ৩৮ ও ১২ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছিল।

জিয়াউর রহমানের বিসমিল্লাহ, হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম এবং বাহাত্তরের সংবিধানের প্রত্যাবর্তনের খায়েশ-এর চিত্তাকর্ষক সাড়ে বত্রিশভাজা'র এক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত সংবিধানে। বর্তমানে দেশ যে হিংসাত্মক ও ঈর্ষান্বিতভাবে বিভক্ত যে কেঁচোগণ্ডুষ করে নতুন সংবিধান প্রণয়নের কথা বলতে বাসনা হয় না। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে স্বৈরশাসন বিরোধী সম্মিলিত আন্দোলনের সময় নতুন করে সংবিধান রচনার একটা বড় স্বর্ণসুযোগ ছিল, সে রকম মাহেন্দ্রক্ষণ আবার কবে আসবে, তা কেবল মাওলাই জানেন।

• লেখক: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক



www.pathagar.com

# আমার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

## লতিফুর রহমান

আমি দু'বছর বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এম.এইচ খন্দকারের শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করি। তখনকার দিনে দু'বছর কোনো একজন সিনিয়র আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবীশ হিসেবে থাকতে হতো এবং দু' বছর পর চেম্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করা যেত। হাইকোর্টের দু'জন বিচারক মৌখিক পরীক্ষা নিতেন এবং ২৪টি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিবরণ তৈরি করতে হতো। বিচারকগণ সেগুলো পর্যালোচনা করতেন। আমি একবারেই চেম্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং ১৯৬০ সালের ১২ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করার সনদ পাই।

হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দিয়ে অ্যাডভোকেট এম এইচ খন্দকারের ৬নং আতশ খান লেন, লালবাগের বাড়িতে ওনার সেরেস্তায় যাতায়াত শুরু করি। শিক্ষানবীশ হিসেবে আমরা তিনজন ছিলাম। উনি আমাকে ছাড়া আর কাউকে উপযুক্ত মনে করে সার্টিফিকেট দেননি। আর যে দু'জন শিক্ষানবীশ হিসেবে এসেছিলেন, একজন খুলনার বারে চলে গেলেন আর একজন বিলেতে চলে গেলেন। আমি কেবল আইনজীবী হিসেবে ঢাকা হাইকোর্টে যোগ দিলাম। এ সময়টা আমি আর্থিক সংকটের মধ্যে ছিলাম। কারণ, তখন আমি সবেমাত্র উকিল হয়েছি, তা ছাড়া আমি নব-বিবাহিত। আমি তখনো গেন্ডারিয়া ১৫৭/২, ডিস্টিলারি রোডের আমার শ্বশুরের বাসায় থাকি, কলেজে শিক্ষকতা করি, প্রাইভেট পড়াই ও মাঝে মাঝে হাইকোর্ট ও আমার সিনিয়রের চেম্বারে যাতায়াত করি। এ অবস্থায় আমার ঢাকায় থাকা সুবিধাজনক বলে মনে হল না। তখন আমার পিতা যশোর বারে ওকালতি করতেন। অন্ধ মানুষ হিসেবে ওকালতি করে যে টাকা পেতেন তাতে তিনি বাড়ির সমস্ত খরচ নিজেই বহন করতেন। তবে আমি প্রত্যেক মাসেই আমার পিতাকে সাধ্যমতো টাকা পাঠাতাম। তিনি টাকা পাঠাতে বারণ করতেন, কিন্তু আমি প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু টাকা পাঠাতাম। ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করার পর বেশ আর্থিক টানাটানির মধ্যে চলতে লাগল।


www.pathagar.com

আমি মনস্থ করলাম যে, আমি সরকারি কলেজে যোগ দেব অথবা কোনো বেসরকারি সংস্থায় একটা ভালো চাকরি নেব। আমি খুব চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। সরকারি কলেজে চাকরির জন্য সবচেয়ে বেশি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো এম এ-তে তৃতীয় শ্রেণী। আমার আগের ফলাফল সবই ভালো ছিল তখন অনার্স ও এম এ দুটোই দ্বিতীয় বিভাগ থাকলে ইংরেজিতে সরকারি কলেজে যোগ দেয়া সহজ ছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। আজ এ বই লিখার সময় যখন আমার কর্মজীবন শেষ হয়ে গেছে তখন বিশেষভাবে মনে হচ্ছে যে, এম এ-তে ওই তিন নম্বর কম পাওয়ায় আমার কর্মজীবনের মোড় ব্যাপকভাবে ঘুরে গেল। যে পরিস্থিতি আমি ওই সময় মোকাবেলা করছিলাম তাতে এম এ-তে ২য় শ্রেণী থাকলে আমি যে সরকারি কলেজে বা অন্য কোনো চাকরিতে যোগদান করতাম সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নিয়তির এমনি খেলা যে সামান্য কয়টা নম্বর পাওয়া বা না পাওয়ার উপরে মানুষের ভাগ্য অনেকখানি নির্ভর করে।

আমি বেসরকারি সংস্থায় চাকরির জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। দর্শনার কেরু কোম্পানিতে একজন ল' অফিসার/ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছিল। আমি খোঁজখবর নিতে থাকলাম। তখন আমার মামা নূরুল হুদা খুলনার সাব জজ ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, জেলা জজের আত্মীয় কেরু কোম্পানির ম্যানেজার। আমি খুলনায় গেলাম। আমার মামা জজ সাহেবের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। জেলা জজ আমার বায়োডাটা ভালো করে দেখে আমাকে একটা গল্প শোনালেন। জেলা জজের নাম আমার মনে পড়ছে না। জেলা জজ এবং তখনকার প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী একসাথে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করার পর মুনসেফ হিসেবে পরীক্ষা দেন। ইমাম হোসেন চৌধুরী মুনসেফি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। আর উনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। উনি আমাকে বললেন, ইমাম হোসেন চৌধুরী মুনসেফ না হতে পেরে খুব ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি প্রধান বিচারপতি আর আমি একজন জেলা জজ মাত্র। উনি এ গল্প শুনিয়ে আমাকে বললেন যে, তুমি হাইকোর্টে উকিল হিসেবে যোগদান করেছ, এটাই করা ভালো। ছোট-খাটো চাকরির খোঁজে ঘুরে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমার মামাও বললেন যে, জেলা জজের কথাই যথার্থ তুমি, ঢাকায় ফিরে যাও। আমি ঢাকায় ফিরে আসলাম। কিন্তু অর্থের সমস্যা ও সাংসারিক নানা প্রকার জটিল সমস্যার কথা চিন্তা করে চাকরির চেষ্টা করতে থাকলাম। সে সময়ে যশোর থেকে আওয়ামী লীগের শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী ছিলেন মাগুরার আঃ খালেক। উনি আমার আব্বার জুনিয়র হিসেবে অনেক মামলায় সহযোগিতা করেছেন। এবং আমাকে


www.pathagar.com

অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মন্ত্রী আঃ খালেক যশোরের অনেককেই দেশে বিদেশে চাকরি দিয়েছেন। আমিও সুযোগে থাকলাম। করাচি থেকে খালেক সাহেব ঢাকা আসলে তাঁর কাছে একটা চাকরির জন্য অনুরোধ জানাব। আঃ খালেক ঢাকায় আসার পর দু একদিন তাঁকে ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া খুব অসুবিধা হয়ে পড়ল। তিনি করাচি থেকে এসে কাকরাইল সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে থাকতেন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে বললেন যে আপনি রাত ১০.৩০ টার পরে এসে বসে থাকলে তাঁর দেখা পাবেন। আমি সার্কিট হাউসের ড্রয়িং রুমে একদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করলাম। তিনি ১১টার কিছু আগে গাড়ি থেকে নামলেন। আমাকে দেখে আমার ডাকনাম শান্তি ধরে ডাকলেন এবং ড্রয়িং রুমে বসালেন। ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করার পর উনি জানতে চাইলেন কেন এত রাত্রে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি। আমি চাকরির জন্য যে দরখাস্ত টাইপ করে নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তখন দরখাস্তটা দেখলেন। দেখে বললেন, আমার হাতে দেশে-বিদেশে অনেক চাকরি আছে। কিন্তু খান বাহাদুর-এর ছেলেকে আমি এসব চাকরি দিতে পারি না। তুমি ওকালতি কর সেটাই ভালো। উনি কিছুতেই দরখাস্তটা নিলেন না। আমি বিফল মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরে গেলাম এবং ভাবলাম চাকরির চেষ্টা না করে ওকালতির চেষ্টা করাই ভালো। সে দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন ছিল। কতটা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটিয়েছি আজ লেখার সময় সেগুলো চিন্তা করতে চাই না। কারণ আমি ও আমার স্ত্রী ঐ দুর্দিনে নানাপ্রকার সাংসারিক সমস্যা নিয়ে একত্রে এগিয়ে গেছি।

আমার বিবাহের তিন-চার মাস আগে আমার শ্বশুর অবসর নিয়েছিলেন। বেশিদিন শ্বশুরের বাসায় থাকা ঠিক হবে না মনে করে আমি আমার পিতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যশোর বারে ওকালতি করার জন্য চলে গেলাম। আমার স্ত্রী ঢাকায় আমার শ্বশুরের বাড়িতে রয়ে গেছেন। আমি যশোরে যাবার সব ব্যবস্থা করলাম। কায়েদে আজম কলেজের অধ্যক্ষ এ. আর. ফাতমীকে আমি আমার সব সমস্যার কথা বললাম। তিনি বললেন, আপনি যশোরে গিয়ে ওকালতি করেন। আপনি যখনই ঢাকায় ফিরে আসবেন আপনার জন্য সব সময় কলেজের চাকরি থাকবে। আমি যশোর বারে যোগ দিলাম। তখন আমার চাচা মসিউর রহমান খুব উচ্চমানের প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারি আইনজীবী ছিলেন। মসিউর রহমান আমার পিতার আপন খালাতো ভাই। তিনি আমার পিতার সহযোগী হিসেবে অর্থাৎ তাঁর হাত ধরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ দুজনার মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমি আমার আব্বার সাথে কোর্টে যাতায়াত করতে লাগলাম। তিনি


www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অন্ধ ব্যক্তি। আমি তাঁর জুনিয়র ও মুহুরিরা সব ধরাধরি করে ওনাকে কোর্টে নিয়ে যেতাম। আমি আমার আব্বার চেম্বারে বসে কাজ-কর্ম দেখতে লাগলাম। আরজি-জবাব লিখতাম, ফৌজদারি মামলার দরখাস্ত লিখতাম, আইনের বই পড়ে শোনাতাম ও তাঁর কথামতো কঠিন ফারায়েজ করতাম। আমার চাচা মসিউর রহমান-এর কাছে আমি প্রকাশ করলাম যে নিম্ন আদালতের পরিবেশ আমার কাছে খুব ভালো লাগছে না। তাছাড়া সাংসারিক অনেক সমস্যা আমাদের পরিবারে। আমার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকায় নানাবিধ সমস্যা উপস্থিত হল। সব বিষয় চিন্তা করে ঢাকায় চলে আসা সাব্যস্ত করলাম। আমার চাচা আমাকে উৎসাহিত করলেন এ বলে যে, বড় জায়গায় ও ভালো পরিবেশে আইন ব্যবসা করলে ভবিষ্যতে ভালো হবে। তাঁর সেরেস্তা থেকে উনি আপিল/ রিভিশন মামলা-মোকদ্দমা পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন বললেন। আমার পিতাও অনুধাবন করলেন যে, আমি যশোরের বারে ওকালতি করা খুব বেশি পছন্দ করছি না।

যশোর বারে থাকাকালীন সর্বপ্রথমে আমি একটা ফৌজদারি আপিল মামলায় তৎকালীন যশোরের জেলা জজের কোর্টে আপিলে যুক্তিতর্ক করি। আমার পিতা আমার পাশে বসেছিলেন। আর ফৌজদারি আপিলের যুক্তি-তর্ক আমি ইংরেজিতে করলাম। মামলাটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা সংক্রান্ত একটা আপিল ছিল। মামলা হয়ে যাবার পর জেলা জজ আমাকে ও আমার আব্বাকে খাস কামরায় ডেকে পাঠালেন। জেলা জজ আমার যুক্তি-তর্ক খুব সুন্দর হয়েছে বললেন। তিনি আমার পিতাকে অনুরোধ করলেন যে, ছেলেকে এখানে না রেখে ঢাকা হাইকোর্টে পাঠানো ভালো, তাতে ভবিষ্যৎ ভালো হবে। আমি নিজেও ঢাকায় চলে আসার চিন্তা ভাবনা করছিলাম। আমার পিতা আমাকে ঢাকা হাইকোর্টে ফিরে আসার জন্য অনুমতি প্রদান করলেন। আমি ঢাকায় ফিরে এসে পুনরায় অধ্যক্ষ ফাতমীর সঙ্গে দেখা করে কায়েদে আজম কলেজে নৈশ বিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দিলাম। আর ২/১ টা প্রাইভেট টুইশনও নিয়ে নিলাম। ...

শুধু অর্থের সংকুলান হলেই সাংসারিক সব দায়িত্ব পালন করা যায় না, যদি না সহধর্মিণীর সাহায্য সহযোগিতা ও সৎ মনোভাবের প্রকাশ না পায়। তাই আমার স্ত্রীর সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আজকাল মেয়েরা কিভাবে সাংসারিক দায়িত্ব মূল্যায়ন করবেন আমি জানি না। তবে আগের দিনে মহিলাদের সংসারের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করতে হতো। নিজে কষ্ট করেও যদি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, সেটাও যে ভালো সেকথা আজকাল মেয়েরা বুঝতেও চাইবে না। যৌথ পরিবারের ধ্যান-ধারণা আজকাল


www.pathagar.com

বিলুপ্তির পথে। তবুও যৌথ সাহায্যের হাত বাড়াবার চেষ্টা ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই করা উচিত।

ওকালতির শুরুতে হাইকোর্টে যাতায়াত করতে লাগলাম, আর আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেট এম এইচ খন্দকার সাহেবের সাথে নথিপত্র ও বইপত্র বহন করতে লাগলাম। আসলে ওকালতি একটি অনিশ্চিত পেশা। তাই মাঝে মাঝে আশা-নিরাশায় ভুগতাম। তবে ভরসা ছিল যে, সাংসারিক খরচ চালানোর জন্য দুটো কলেজের বেতন ও প্রাইভেট টুইশনে যে টাকা পেতাম তাতে গরিবের সংসার মোটামুটি চলে যেত তখনকার দিনে খরচও কম ছিল। আর আমাদের চাহিদাও খুব সামান্য ছিল। এভাবে আমার ওকালতি জীবন শুরু হল। গেন্ডারিয়ায় নূরুল হক নামে একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন। তাঁর সাথে আমার শ্বশুরের পরিচয় ছিল। কারণ দু'জনই গোপালগঞ্জের লোক। তিনি আমাকে নূরুল হক অ্যাডভোকেটের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। আমার বাসার কাছে নূরুল হকের বাসা হওয়ায় আমার যাতায়তের জন্য সুবিধা হল। নূরুল হক নিম্ন আদালতেও ওকালতি করতেন। তাই তাঁর সাথে আমি তার জুনিয়র হিসেবে সব কোর্টেই ঘোরাফেরা করতাম। এভাবে আমার সাথে ব্যারিস্টার আসরারুল হোসেন এর পরিচয় হল। তিনি স্বেচ্ছায় আমাকে তাঁর চেম্বারে যোগ দেয়ার জন্য বললেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেম্বারে যাওয়া শুরু করলাম। তাঁদের সাথে থেকে আমি কাজকর্ম শিখতে লাগলাম। ব্যারিস্টার আসরারুল হোসেন অত্যন্ত বড় মনের লোক। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার মনে পড়ে, পশ্চিম পাকিস্তানে একটা মামলা পরিচালনা করার জন্য উনি আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু তখন অ্যাটর্নিও না, তবুও আমাকে নিলেন স্নেহের টানে। ওই মামলাটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাকির আহমেদ (পরবর্তীতে বিচারপতি জাকির আহমেদ)। ওই মামলায় আসরারুল হোসেন-এর সিনিয়র ছিলেন মঞ্জুর কাদের। আমি আসরারুলের সাথে মঞ্জুর কাদেরের সেরেস্তায় ৩/৪ দিন গিয়েছি এবং সুপ্রিম কোর্টে মামলা পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলাম। এ অভিজ্ঞতা আমার জন্য খুব একটা বড় বিষয় ছিল। এভাবে আসরারুল হোসেনের সেরেস্তায় আমি ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। আমরা যেভাবে সিনিয়রের চেম্বারে কষ্ট করে কাজ শিখেছি ও কোর্টে উপস্থিত থেকে আইনজীবীদের উপস্থাপনা লক্ষ্য করেছি ও আইনের বইপুস্তক পড়াশুনা করেছি, আজকের আইনজীবীরা কিন্তু সেভাবে তাঁদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন না। আজকের আইনজীবীরা শুধু কিভাবে অল্প পরিশ্রমে টাকা উপার্জন করা যায় সেদিকে ব্যস্ত। সত্যিকার অর্থে, মেধার চর্চা থেকে নবীন আইনজীবীরা অনেক দূরে সরে গেছে। আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টে


www.pathagar.com

২০ জন ভালো উকিলের নাম নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। এর ফলশ্রুতিতে আইন পেশার মান ও সুনাম অনেক কমে গেছে।

যশোর ও পাশের জেলা থেকে বেশ মামলা মোকদ্দমা আসতে লাগল। আমি খুব যত্ন সহকারে ঐসব মামলা পরিচালনা করতে লাগলাম এবং অনেক মামলায় মক্কেলদের কথামতো অনেক নতুন নতুন সিনিয়র অ্যাডভোকেট নিয়োগ দিয়ে তাঁদের সাথে পরিচিত হতে লাগলাম। কারো চেম্বারে গিয়ে সর্বক্ষণের জন্য বসা সম্ভব ছিল না। তাই নিজেই নিজের চেম্বারে একটা আইন ক্লার্ক শারদাকে (মুহুরি) রেখে দিলাম। যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া থেকে বেশ মামলা মোকদ্দমা আসতে শুরু করল। আমার পিতা একজন অন্ধ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ওপর লোকের অত্যন্ত আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তাছাড়া আমার চাচা মসিউর রহমান একজন নামকরা ফৌজদারি উকিল ছিলেন। এখানে একটা মজার কথা মনে পড়ছে। অনেক সময় এমন হত যে, দু'পক্ষই আমার কাছে হাজির হত তাঁদের মামলা পরিচালনা করার জন্য। তখন এক পক্ষকে বলতে হত যে, আমি আর এক পক্ষের মামলা গ্রহণ করেছি। কাজেই ২য় পক্ষকে অন্য কোনো আইনজীবী নিয়োগ করার কথা বলে ফেরত দিতাম। কিন্তু যাঁকে ফিরিয়ে দিতাম তিনি অত্যন্ত মন খারাপ করতেন। আসল অর্থে মন খারাপ করার কোনো কারণ ছিল না। কারণ, আমি মাত্র ৩/৪ বছরের একজন অনভিজ্ঞ আইনজীবী। কিন্তু মক্কেলদের আমার পিতার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ভালো আইনজীবীর ছেলে ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি করেন, তাই তিনি নিশ্চয় খুব বড় একজন উকিল হবেন, এ বিশ্বাস মক্কেলদের মধ্যে খুব কাজ করত। অর্থাৎ আইন পেশায় আমার পিতার যে সুনাম ও সততার স্বীকৃতি তাঁর সবটাই আমার উপর বর্তায়। আমি অবশ্য খুব পরিশ্রম করে মামলা- মোকদ্দমা করতাম এবং অতি অল্প সময়ে ওকালতিতে সুনাম অর্জন করি ও ঢাকা হাইকোর্টে নামকরা বিচারপতিদের সুনজর পড়ে আমার উপর। আইন ব্যবসাকে Jealous Mistress বলা হয়। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, আইন ব্যবসায় যদি পিতা নিয়োজিত থাকেন তবে খুব ভালো, আর তা না হলে শ্বশুর যদি উকিল হন তা হলে মন্দের ভালো; আমার ব্যাপারে এ কথাটা প্রযোজ্য। আমার পিতাই শুধু নামকরা উকিল ছিলেন না, আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকে আইনজীবী পরিবার থেকে এসেছি। তবে আমরা যখন ওকালতি করি তখন কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় লক্ষ্য করেছি। তখন সদ্য বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারদের অনেককেই বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করতে দেখেছি। এটাও কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আইন পেশায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সহায়তার ভূমিকা পালন করে। আইন ব্যবসায়ে টিকে থাকা সত্যিকার অর্থে


www.pathagar.com

খুব কষ্টকর। বিশেষ করে আমাদের দেশে যখন আমরা বেশির ভাগ শিক্ষিত লোক মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। আইন ব্যবসায়ে একটু ভালো করার সঙ্গে সঙ্গে আমি দুই কলেজের চাকরি ছেড়ে দিলাম এবং আইন ব্যবসায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলাম।

খুব সম্ভব ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কলেজের চাকরি ছাড়ি এবং পূর্ণাঙ্গ আইনজীবী হিসেবে ঢাকা হাইকোর্টে কাজ শুরু করি। আইনজীবী থাকাকালে আমি ফৌজদারি, দেওয়ানী, রিট ও নানা মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করি। হাইকোর্টে আইন ব্যবসা পরিচালনা করার সময় আমি মাঝে মাঝে নিম্ন আদালতে উপস্থিত হতাম। কারণ ২/৩ টি সংস্থার আইন উপদেষ্টা থাকায় আমাকে নিম্ন আদালতে যেতে হত। নিম্ন আদালতের পরিবেশ আমার ভালো লাগত না। কারণ, সেখানে অনেক হৈ- চৈ গণ্ডগোল। বিশেষ করে কোর্টের ভেতরে এত কথাবার্তা হত যে আইনজীবী হিসেবে সুষ্ঠুভাবে কোনো কিছু বলবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলতাম। মনে হত কেউ যেন আমার উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করছে না। অবশ্য আমরা যখন আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলাম তখন হাইকোর্টের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরাম ছিল। নিম্ন আদালতের সামগ্রিক পরিবেশ আজও অত্যন্ত খারাপ।

নবীন আইনজীবী হিসেবে একটা মোশন মামলা ডিভিশন বেঞ্চে পেশ করি। ওই বেঞ্চে সিনিয়র বিচারক ছিলেন বিচারপতি বাকের। আমি এ মামলা প্রথম মঞ্জুরির জন্য প্রায় ১৫ মিনিট Argument করি। জজ সাহেব মামলাটি গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। অবশেষে আমার উপস্থাপনায় বিচারকগণ মামলা মঞ্জুর তো করলেনই তার সাথে জামিন ও জরিমানার টাকা স্থগিত করে দিলেন। ওই কোর্টে তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় ফৌজদারি উকিল ফরিদপুরের আবদুস সালাম খান উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন, আমার উপস্থাপনার প্রশংসা করলেন এবং যেভাবে আমি আমার উপস্থাপনায় জজদের বশ করলাম তাতে তিনি বলতে বাধ্য হলেন যে, Young man your art of advocacy is superb. সালাম খান তারপর থেকে কোনো ফৌজদারি মামলা আসলে তাঁর মুহুরিকে দিয়ে ড্রাফট করার জন্য ফাইল আমার কাছে পাঠাতেন। উনি অনেক মামলায় আমাকে জুনিয়র রাখতেন। সালাম সাহেব ব্রিফ পড়তেন একটু কম, আমার সাথে কথাবার্তা বলে মামলার বিষয়বস্তু জানার চেষ্টা করতেন। আমি যেসব মামলায় তাঁকে আগে থেকে বলতাম যে, স্যার কোনো রিলিফ পাবেন না, সেসব মামলায় আসলেই তিনি বিচারকদের কাছ থেকে কোনো সুবিধাজনক ফল পেতেন না।


www.pathagar.com

এভাবে আঃ সালাম খানের একটা বিশ্বাস আমার ওপর জন্মাল এবং আমি নিজেও অনেক মামলায় তাঁকে সিনিয়র হিসেবে নিতাম। এছাড়া আমি এএসএম সায়েম (পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি)-এর সঙ্গেও অনেক মামলা মোকদ্দমা করেছি। সায়েম সাহেব আমার আব্বার খুব বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বিচারপতি সাত্তার ও বিচারপতি সায়েম একটা ডিভিশন বেঞ্চে ছিলেন। আমি সে বেঞ্চে কোনো একদিন একটা মামলা পরিচালনা করছিলাম। মামলাটি জজরা গ্রহণ করবেন না, আমিও ছাড়ব না। এভাবে মামলা চলাকালীন টিফিন হয়ে গেল। টিফিনের সময় বিচারপতি সায়েম আমাকে চেম্বারে ডাকলেন। উনি জানতেন যে, আমি কায়েদে আজম কলেজে শিক্ষকতা করি। উনি আমাকে বললেন, "তুমি কি আমাদের কায়েদে আজম কলেজের ছাত্র পেয়েছ। যেভাবে তুমি Argument করছ, তাতে মনে হচ্ছে তুমি ছাত্র হিসেবে আমাদের পড়াচ্ছ।" আমি খুব লজ্জিত হলাম ও দুঃখ প্রকাশ করলাম। নিজে Argument করার সময় নিজের ৩০২ ধারায় দণ্ডবিধির আওতায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৭ জন আসামির একটি মামলা। মামলাটি আমি নিজেই হাইকোর্টে দ্বৈত বেঞ্চে পরিচালনা করি এবং শাস্তি বহাল থাকে। আইনজীবী হিসেবে আমার ধারণা ছিল যে, মামলাটি খালাস হওয়ার মামলা। তাছাড়া ওই মামলায় হাইকোর্টে কোনো সিনিয়রও ছিল না অথবা সিনিয়র রাখার প্রয়োজনও বোধ করিনি। মামলায় হেরে যাওয়ার পর মক্কেলদের বললাম যে, সুপ্রীম কোর্টে আপিল করতে হবে। আমার কাছ থেকে নথি নিয়ে একজন সিনিয়র উকিল নিয়োগ করুন। কারণ মামলা ভালো, ফল পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি তাদেরকে বললাম, আমার কাছ থেকে নথি নিয়ে যান। কিন্তু তাদের অভিমত ছিল এরকম যে, আপনি এ মামলায় তো থাকবেনই বরং আপনার পছন্দমত সিনিয়র দিয়ে মামলাটি পরিচালনা করবেন। তাই করা হলো। রাজশাহীর অ্যাডভোকেট আঃ আজিজকে সিনিয়র রাখা হলো। উনিও আমার সাথে একমত যে, মামলাটি খালাসের মামলা। সুপ্রীম কোর্টে প্রথম লিভ হলো, পরে শেষ শুনানিতে মামলায় জয়লাভ করলাম, আসামীরা বেকসুর খালাস পেল।

এ ঘটনার অবতারণা করার উদ্দেশ্য এটাই যে, মামলায় হার-জিত তো আছেই। কিন্তু আইনজীবী হিসেবে আপনাকে বুঝতে হবে যে, মামলায় আইনের তর্ক ও ঘটনার বিবরণ কতটা যুক্তিযুক্ত। আমি বর্তমান আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, মামলায় হেরে যাওয়া বড় কথা নয়। আপনারা সঠিকভাবে মামলা পরিচালনা করছেন কি-না সেটাই বড় কথা। এর উপরেই আপনাদের ওকালতি জীবনের সাফল্য ও সুনাম নির্ভর করবে।


www.pathagar.com

আমি বিচারপতি সেকেন্দার আলী একক বেঞ্চে একটা দেওয়ানি রিভিশন মামলা করছিলাম। সে মামলায় আমি জজ সাহেবকে আইনের তর্ক সঠিকভাবে বুঝাতে পারছিলাম না, তখন তিনি মামলাটি খারিজ করতে উদ্যত হন। বিচারক একটু রাগী প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমি সময়ের জন্য প্রার্থনা করলাম, বিচারক সময় না দিয়ে টিফিনের পর মামলার শুনানি করবেন বললেন। তখন আমি খুলনার অ্যাডভোকেট মইনুল হকের শরণাপন্ন হলাম। উনি মামলাটিতে পয়েন্ট আছে বলে উল্লেখ করলেন এবং আমাকে দু'একটা ডিসিশনের কথাও বললেন। আমি ঐ ডিসিশনগুলো দেখে পুনরায় বিচারকের সামনে মামলা উপস্থাপন করলাম এবং মামলায় জয়লাভ করলাম। এতো পরিশ্রম করে যদি সিনিয়র আইনজীবীর সাহায্য না নিতাম, তাহলে মামলায় হেরে যেতাম এবং মক্কেলকে বলতাম যে, জজ সাহেব রায় দিয়েছেন কাজেই আমার কিছুই করার নেই। বিচারকের উপর দোষ চাপিয়ে আমি নিজে রেহাই পেয়ে যেতাম। তাই আমি আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানাবো, আপনারা পরিশ্রম করুন, আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করুন এবং আইনে জ্ঞানলাভ করুন যাতে বিচারপ্রার্থীরা উপকৃত হয়। ...

একবার বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আমাকে ডেকে পাঠান। তাঁরা উভয়ই আমাকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ক্রাইম) পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁদের অভিমত যে, আমি ২/১ বছর এ পদে কাজ করার পর হাইকোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যাব। আমি কালবিলম্ব না করে তাঁদের সামনেই বলে দিলাম যে আমি এ পদ গ্রহণ করব না। আমার উত্তরে তাঁরা একটু বিব্রত ও অপমানিত বোধ করলেন। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী আমার মামাকে সরাসরি আমার ডাকনাম ধরে বললেন যে, ওকে আমরা ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল করার প্রস্তাব দিলাম অথচ সে আমাদের মুখের উপর তা নাকচ করে দিল। আমার মামা আমাকে টেলিফোনে জানালেন যে, তুমি পরেও না করতে পারতে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী আমার কথায় কষ্ট পেয়েছিলেন সেটা বুঝতে পারলাম। আসল কথা আইন ব্যবসা তখন খুবই ভালো ছিল। আর বিচারক হওয়ার জন্য ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। কারণ উপযুক্ত বিবেচিত হলে সরাসরি বার থেকে বিচারক পদ অলংকৃত করব।

বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর (পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি) বেঞ্চে মামলা করতে অস্বস্তি বোধ করতাম। কারণ উনি আমাকে বেশ প্রশ্ন করে জর্জরিত করতেন। ঘটনাটা তাঁকে নিয়েই, আমার পিতার জুনিয়র ছিলেন যশোরের ফৌজদারি আইনজীবী নূরুল ইসলাম একটা ফৌজদারি মামলা নিয়ে এলেন


www.pathagar.com

আমার সেরেস্তায়। মামলাটি বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর একক বেঞ্চে দাখিল করতে হবে। তাই আমি ওনাকে একজন সিনিয়র উকিল রাখতে বললাম, যদিও মামলাটিতে আইনের তর্ক খুব ভালো ছিল। উনি বললেন মামলাটি তুমি করো। যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় আমি তোমার পাশে উপবিষ্ট থাকব। মামলাটি বি এ সিদ্দিকীর বেঞ্চে ২০ মিনিট উপস্থাপনা করার পর উনি মামলা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন। তখন আমি আবার উপস্থাপনা শুরু করলাম। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে মামলা গ্রহণ করব তবে Rule for enhancement অর্থাৎ শাস্তি কেন বাড়বে না সেটা বিবেচনা করা হবে আমি তাতেই রাজি। মামলা মঞ্জুর হল, জামিন হল ও জরিমানার টাকা স্থগিত হল। আমি খুব অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লাম। কারণ জেলা কোর্টের আইনজীবী নূরুল ইসলামের সামনে এরকম একটা ঘটনা ঘটল। উল্লেখ্য যে, সে মামলা বিচারপতি বাকেরের একক বেঞ্চে আমি একা পরিচালনা করি ও মামলায় জয়লাভ করি। এছাড়া আরও অনেক মামলা মোকদ্দমায় বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর বেঞ্চে আমি বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছি। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত্ যে, বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী অবসর নেয়ার অনেক পরে আমি বিচারপতি নিযুক্ত হই। একদিন ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের বাসায় একটা মধ্যাহ্ন ভোজে বিচারপতি হিসেবে আমি নিমন্ত্রণ পাই। ভোজসভায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওই দিন যে কথাটি বলেছিলেন সেটা হুবহু উদ্ধৃত করতে চাই : I am happy young man that you have become a judge. I knew it as well. তখন আমার মনে হল বিচারক হিসেবে তিনি আমাকে সব সময় বাজিয়ে দেখতেন যে, আইনজীবী হিসেবে আমি কতটা দক্ষ ও পারদর্শী।

পরবর্তীকালে আমি বারের সদস্য হিসেবে ১৯৭৯ সালের ২১ নভেম্বর সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগে অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন আমাকে শপথবাক্য পাঠ করান। বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন আগে আমার মতামত নেন। কিন্তু আমাকে একদিন বললেন যে, বিচারপতি সাত্তার, যিনি আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমার বয়স অনেক কম হওয়ায় আমার নিয়োগ নিয়ে আপত্তি করাতে এতদিন দেরি হল। বিচারপতি সাত্তার-এর ধারণা ছিল যে, ৪৫ বছরের আগে হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ দেয়া ঠিক না। যা হোক প্রধান বিচারপতি আমার নাম এবারে সুপারিশ করায় আমি অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। ৪৩ বছর ৮ মাস। সাধারণত অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করা


www.pathagar.com

হয় দু'বছরের জন্য, পরে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় বিচারকের দক্ষতা ও গুণাবলি বিশ্লেষণ করে। আমি যখন হাইকোর্ট বিভাগে অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করি তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিচারপতি সাত্তার। প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিনের সুপারিশ আইন মন্ত্রণালয় থেকে বিচারপতি সাত্তারের অনুমতি নিয়েই আমাকে বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়। একটা আশ্চর্যের বিষয়, আমাকে বিচারক করার পর বিচারপতি সাত্তার ২/১ জনের কাছে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিচারপতি লতিফুর রহমান আওয়ামী লীগ সমর্থিত একজন ব্যক্তি এবং তিনি ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের সেরেস্তায় যাতায়াত করেন, তাঁকে বিচারপতি করা ভুল হয়ে গেছে। তখনকার একজন মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার (সাবেক স্পিকার) আমার কাছে নিজে একথা বলেছেন। এছাড়া আমাকে স্থায়ী বিচারক করার ব্যাপারেও তৎকালীন সরকারের এরূপ মনোভাব ছিল। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সত্যই জয়লাভ করেছে।

আমি যখন অস্থায়ী বিচারপতি ছিলাম, সে সময়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক সেনা অভ্যুত্থানে ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হন। এ মামলাটি কোর্ট মার্শাল এ বিচার হয় এবং ১২ জন সেনা কর্মকর্তার ফাঁসির আদেশ হয়। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে সাজাপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারগণ রিট পিটিশন দাখিল করেন। ওই রিট পিটিশনের মামলা আমাদের বেঞ্চে শুনানির জন্য আসে। বিচারপতি মরহুম ফয়জুল ইসলাম চৌধুরী সিনিয়র জজ ছিলেন। আর আমি কনিষ্ঠ অস্থায়ী বিচারক ছিলাম। আমি তখন লালমাটিয়ায় আমার নিজের বাড়িতে থাকি। হঠাৎ ঢাকার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন করে আমাকে বলা হল যে, আজ মধ্যরাত থেকে আমার লালমাটিয়ার বাসায় পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করা হবে। সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমি একজন অস্থায়ী বিচারক হিসেবে একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। প্রত্যেক আসামির জন্য একজন করে উকিল নিয়োগ করায় শুনানি দীর্ঘায়িত হতে থাকল। ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ড. জহির, সিরাজুল হক, আরও অনেকেই মামলার আইনজীবী নিযুক্ত ছিলেন। মামলা দু'দিন চলার পর হঠাৎ বিচারপতি এ. টি. এম. আফজাল এ মামলার অগ্রগতি জানার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং মত প্রকাশ করলেন যে, মামলাটি একটু দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করলে সফল হয়। এতগুলো লোকের জীবন-মরণের বিষয় এবং এত আইনজীবী নিয়োজিত হয়েছে এ মামলায়,


www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে তার শুনানি একটু বিলম্বিত হবে। বিচারপতি আফজালের কথাতে আমি বুঝাতে পারলাম যে, মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যিনি সেনা প্রধান ছিলেন তিনি এ মামলাটি ত্বরান্বিত করার জন্য আফজালকে অনুরোধ করেছিলেন এবং আফজাল তাঁর মনোভাব আমাকে জানালেন। বিচারপতি আফজাল বিশেষ ভদ্রলোক। তিনি সাধারণত এসব ব্যাপারে কাউকে অনুরোধ করার ব্যক্তি নন। তবে পরিস্থিতি নিশ্চয় খারাপ ছিল। বিশেষ করে আমার ব্যাপারে বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিল। সেজন্য বন্ধু হিসেবে তিনি শুধু মামলাটি সত্বর নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া রাত্রে ২/১ টা টেলিফোন আসত। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলা হত মামলা দ্রুত করার জন্য। ইংরেজিতে আমাকে টেলিফোনে যেভাবে বলা হত তাতে একথাগুলো ক্যান্টনমেন্টের কোনো সেনা কর্মকর্তা বলছেন বলে আমার ধারণা হল। আমি লালমাটিয়ায় আমার বাসায় সাধারণত যে বেডরুমে ঘুমাতাম সে বেডরুম পরিবর্তন করে অন্য ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকতাম। আমি ও আমার বাসার সকলেরই একটু ভয় ভয় লাগত। সিনিয়র বিচারপতি ফয়জুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে জানান যে, তিনিও এরকম ফোন পেতেন। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য ছুটির দিনেও আমার কোর্ট করতাম। এ মামলায় কিন্তু জেনারেল কোর্ট মার্শালে ১২ জন সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ রিট মামলার মোটামুটি বক্তব্য ছিল যে, সেনা কর্মকর্তাদের মানবাধিকার লংঘন করে কোর্ট মার্শাল অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোর্ট মার্শাল আইনগতভাবে গঠিত হয়েছে বলে অ্যাটর্নি জেনারেল কে বাকের আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের ৫ উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোর্ট মার্শাল প্রতিরক্ষা শৃঙ্খলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রিট মামলা দাখিল করার কোনো এখতিয়ার নেই। তাছাড়া অ্যাটর্নি জেনারেল বক্তব্য পেশ করেন যে জেনারেল কোর্ট মার্শাল সঠিকভাবে গঠিত হওয়ায় আইনগত ও কার্যবিধিগত কোনো দোষ বিচার করার ক্ষমতা আমাদের নেই। দু' পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে আমরা মামলার রায় প্রদান করলাম যে, ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালের বিচার আমাদের কোর্টের এখতিয়ার বহির্ভূত। আমার সিনিয়র জজ বিচারপতি ফয়জুল ইসলাম চৌধুরী আমাকে এ মামলার রায় লেখার জন্য বললেন এবং আমার লেখা ছোট রায়টি উনি কোর্টে পড়ে শোনান। এভাবে মামলাটি খারিজ করলাম। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট আমাদের রায় বহাল রাখে।

আমার মনে হয়, আমাদের দেশে যখন এত রাজনৈতিক হিংসা ও বিদ্বেষ


www.pathagar.com

আছে, তখন কোনো অস্থায়ী জজকে ঝামেলাপূর্ণ বেঞ্চে না দেয়াই ভালো--তাহলে পরবর্তীতে তাঁর স্থায়িত্ব নিয়ে কথা ওঠে, যেটা আমার ব্যাপারে উঠেছিল। এছাড়া আমি অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার পর প্রায় ৬ মাস রিট বেঞ্চে বসি মরহুম বিচারপতি সৈয়দ মোঃ হোসেনের সাথে। সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন খুব সাহসী ব্যক্তি ছিলেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা না করে . তাঁর মনে যেটা আসত সেটাই বলে ফেলতেন। তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থক ছিলেন সেটা প্রকাশ্যে বলতেন। ওনার সঙ্গে ৬ মাস রিট বেঞ্চে বসার ফলে সকলেই একটু ধারণা করল যে, আমি উনার দর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমি একজন অস্থায়ী জুনিয়র জজ। হাইকোর্টের রেওয়াজ অনুযায়ী সিনিয়র জজের সাথে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একমত হওয়াই উচিত। তখনকার প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, বিচারপতি কেএম সোবহান ও বিচারপতি মুহম্মদ হোসেন খুব বন্ধু ছিলেন এবং সব সময় একত্রে চলাফেরা করতেন। স্বাভাবিকভাবে আমি আমার সিনিয়র জজকে বেশি সমীহ করতাম। তাছাড়া অস্থায়ী জুনিয়র জজের অনেক অসুবিধা থাকে। আরেকটা মামলার কথা এখানে উল্লেখ করি। হাবিবুল্লাহ খান তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন। কোনো একটা রিট মামলায় তিনি অভিযুক্ত ছিলেন না কিংবা মামলার পার্টিও ছিলেন না। অথচ বিচারপতি এস এম হোসেন ও আমার বেঞ্চ থেকে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমিও সে রায়ে স্বাক্ষর করি। চেম্বারে সিনিয়র জজকে শুধু বলেছিলাম যে, যাঁকে আমরা জরিমানা করলাম, তিনি মামলার কোনো পক্ষ না, তাঁকে না শুনে জরিমানা করা কি ঠিক হবে? তবে জুনিয়র জজের কথা হালে পানি পেল না। অবশ্য পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্ট আমাদের রায় নাকচ করে দিয়েছিল। এসব নানা বিতর্কিত মামলায় আমি অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে জড়িয়ে পড়লাম। যখন স্থায়ী বিচারক হিসেবে আমার নিয়োগের কথা ছিল। তখন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের অভিমত ছিল যে, এক বছরের জন্য আমার বিচারকের দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হবে। প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি আমাকে নিজে অবহিত করেছেন যে, সাত্তার সাহেবকে তিনি সোজা বলেছিলেন, আমাকে স্থায়ী বিচারক নিয়োগ দিতে হবে নতুবা বাদ দিতে হবে। কামালউদ্দিন হোসেন আমাকে বলেছেন, আপনাকে আমি একজন সৎ, দক্ষ ও নির্ভীক বিচারক হিসেবে জানতাম বলেই আমি এ অভিমত ব্যক্ত করি। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে একমত হয়ে আমাকে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। আমি ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্থায়ী বিচারক হিসেবে শপথগ্রহণ করি। ১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আমি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। দশ


www.pathagar.com

বছরের বেশি সময় আমি হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারকের দায়িত্ব পালন করি। বিচারকার্য পরিচালনা করার সময় কোনো মনোমালিন্য বা সদভাবের অভাব হয়নি। বিচারকার্য পরিচালনা করার সময় আমি সব সময় আইনজীবীদের সাথে অত্যন্ত সদ্ভাব রক্ষা করতাম। এটা আমার স্বভাবজাত।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২৪ মার্চ, ১৯৮২ সালে মার্শাল ল' প্রবর্তন করেন এবং এপ্রিল মাসে হাইকোর্ট ভেঙে জেলায় পাঠিয়ে দেন। তখন আমি রংপুরের বেঞ্চে চলে যাই এবং রংপুরে প্রায় তিন বছরের কিছু কম সময় অতিবাহিত করি। বিচারপতি এস. এম. হোসেন তখন রংপুরে সিনিয়র বিচারক ছিলেন। ওই সময়টা হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে আমরা খুব একটা অবদান রাখতে পারিনি। তাছাড়া পারিবারিক গণ্ডি থেকে বাইরে থাকার কারণে নানারকম অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলাম। ঐ সময় বিচারকার্য খুব বেশিভাবে ব্যাহত হয়। হাইকোর্ট জেলায় নিয়ে যাওয়ার ফলে বিচারকরা নানারকম মানসিক ও শারীরিক অসুবিধার মধ্যে পড়েন এবং কোর্টের ভাবমূর্তিও নষ্ট হয়। উচ্চ আদালতের সুনাম নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অষ্টম সংশোধনী মামলার ফলে জেলায় স্থাপিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আবার রাজধানীতে ফিরে আসে। কিন্তু কোর্টের মর্যাদা, সুনাম ইতিমধ্যে অনেক ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। নিম্ন পর্যায়ে হাইকোর্ট ডিভিশনকে নিয়ে যাবার ফলে কোর্ট প্রাঙ্গণে যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে সেটা আজও সরানো সম্ভব হয়নি বলে আমার ধারণা। ...

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ১৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১ জানুয়ারি ১৯৯০ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি আমাকে শপথবাক্য পাঠ করান। ...

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ টাকা পয়সা বেশি খরচ করা পছন্দ করতেন না। তিনি নিজের টাকার জন্য যেরূপ মায়া করতেন সেরূপ সরকারের ও পরের টাকার জন্যও মায়া করতেন। তাঁর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেটা আপিল বিভাগে আমার জজ থাকাকালীন ঘটেছে। আমি তখন সবেমাত্র আপিল বিভাগের জজ হয়েছি। ৪৪ নং মিন্টু রোডের বাসায় থাকি। আমার ড্রয়িংরুমের পর্দা বদল করা প্রয়োজন। ওই সময়ে আমার মেজো মেয়ে রুম্পা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেড়াতে এসেছিল। সে বলল, পর্দার কাপড় আমি পছন্দ করে দেব। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমার মেয়ে যে পর্দার কাপড় পছন্দ করল তাঁর প্রতি গজ ১১০ টাকা। আমি তৎকালীন


www.pathagar.com

রেজিস্ট্রারকে ডেকে বললাম, আমার মেয়ে ১১০ টাকা গজের কাপড় পছন্দ করেছে এবং ঐ ঘরের পর্দার জন্য দশ হাজার টাকার উপরে লাগবে। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার বললেন, এটা কোনো ব্যাপার না। পর্দা সময় মতো এসে গেল ও লাগানো হল। অনেকদিন পর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আমাকে ডেকে বললেন যে আমার এক ঘরের পর্দার দাম এসেছে দশ হাজার টাকার উপরে। অথচ প্রধান বিচারপতির বাসায় চল্লিশ টাকা গজের পর্দা লাগানো হয়। আমি বললাম, আমি শৌখিন লোক, তাছাড়া আমার মেয়ে এটা পছন্দ করেছে। আমি জানতে চাইলাম, এখন আমাকে কি করতে হবে? তখন তিনি বললেন, আপনি সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে দিন, বাকিটা সরকার দেবে। ওই ভাবে নোট লেখা হল। আমি টাকা দিয়ে দিলাম। টাকা দেয়ার পর আমার কিন্তু প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা অনেক বেড়েছে। এ রকম একটা ঘটনা খুব বিরল। আমার বন্ধুবান্ধব অনেকেই বিষয়টা জানে। এতে শুধু প্রমাণ হয় যে, তিনি সরকারি অর্থ সাশ্রয় করার জন্য সব সময় চিন্তা করতেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা বই থেকে সংগৃহীত

- লেখক : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি


www.pathagar.com

# উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে বাধা নেই

এবিএম খায়রুল হক

ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের উচ্চ আদালতে বাংলার ব্যবহার অনেক কম। এরকম হওয়া উচিত ছিল না। তবে সেই বৃটিশ আমল থেকে উচ্চ আদালতে আইনজ্ঞরা শুনানি ইংরেজিতে করতেন। এবং রায়ও হতো ইংরেজিতে। কারণ আমাদের হাইকোর্ট রুলসে বলা ছিল, আবেদন এবং অন্য সব কিছু ইংরেজিতে হবে।

এই একশ' বছরের ঐতিহ্য ভাঙা কঠিন। এছাড়া আমাদের দেশের বেশিরভাগ আইন ইংরেজিতে। এবং যত নজির আছে সব ইংরেজিতে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আইনজীবীরা ইংরেজিতে যুক্তি উপস্থাপন এবং বিচারকরাও রায় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। স্বাধীনতার ৪১ বছর পার করেছি। সেই হিসেবে আমাদের বাংলার দিকে আরো মনোযোগী হওয়া উচিত। অল্প কয়েকজন বিচারপতি হলেও বাংলায় রায় দেয়ার চল শুরু হয়েছে। তাই সকলেরই বাংলায় যুক্তি উপস্থাপন এবং রায় প্রদান করা উচিত।

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ সালে প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত নিম্ন আদালত কিংবা উচ্চ আদালতের সবার অফিসিয়াল ভাষা ছিল ইংরেজি। তাই বাধ্য হয়ে ইংরেজি ব্যবহার করতে হতো। এর আগ পর্যন্ত যাবতীয় আইন প্রণীত ছিল ইংরেজিতে। কোর্টের ভাষা ছিল ইংরেজি, আইন ছিল ইংরেজি। তাই কেউ না চাইলেও তাকে বাধ্য হয়ে ইংরেজি ব্যবহার করতে হতো। ১৯৮৭ সালের আগের অনেক ইংরেজি আইনের অথেনটিক বাংলা টেক্সট নেই। এ কারণে এখানেও ইংরেজির ব্যবহার করতে হয়।

আমাদের অভিভাবকতুল্য সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০১২ সালে এক নিবন্ধে লিখেন, '১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু



www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে স্বাধীনতার তিন বছর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এ আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধাসরকারি অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোনো অন্যথা হলে উক্ত বিধি লঙ্ঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তাব্যক্তিগণ সতর্কতার সঙ্গে এ আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি-বিধান ব্যবস্থা করবেন।'

তিনি আরো লিখেন, 'সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিগত বিলের প্রস্তাবের ওপর ১৯৮৭ সালের ২ নং আইন পাস করা হয়। ওই আইন প্রচলনের পরও নিম্ন আদালতে কিছু মামলায় বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে আরজি দাখিল করা হয়। দেওয়ানি কার্যবিধির ৭ নং আদেশের ১১ নং নিয়ম অনুসারে আরজি বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অনুসারে বাংলায় না হয়ে ইংরেজিতে লেখা হওয়ায় ওইসব মামলার বিবাদী পক্ষ আরজি খারিজ করার জন্য আবেদন করে। নিম্ন আদালত ওইসব দরখাস্ত শুনানির পর তা বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা করে। নিম্ন আদালতে ইংরেজিতে আরজি, জবাব, দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল করা বৈধ বলে ঘোষণা দেন। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে 'অন্য আইনে যাহাই কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর হইবে' বাক্যটি না থাকায় অনেকে মনে করেন, আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি। হাইকোর্ট রায় দেন যে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিও চলবে। 'হাশমতউল্লাহ বনাম আজমিরি বেগমে'র মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ বাংলা ভাষা প্রচলন আইনকে সংবিধানের পরিপন্থী বা বেআইনি ঘোষণা না করলেও অধঃস্তন দেওয়ানি আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার আইনসম্মত বলে ঘোষণা করেছেন।'


www.pathagar.com

হাইকোর্টে বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিচারপতি এআরএম আমিরুল ইসলাম চৌধুরী হচ্ছেন পথিকৃৎ। তিনি সর্বপ্রথম সকল আদেশ, নির্দেশ ও রায় বাংলায় দেয়া শুরু করেন। তার অবদানকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমি নিজে বেশ কিছুদিন থেকে চিন্তা করেছিলাম বাংলা ভাষায় রায় দেয়াটা ভাষা সৈনিকদের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য। তবে যেহেতু হাইকোর্ট রুলসে বলা আছে ইংরেজিতে সব আবেদন হবে। তাই একটু সংশয়ে ছিলাম। এর মধ্যে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তিনটি নিবন্ধ আমার নজরে আসলো জনকণ্ঠ পত্রিকায়। তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বাংলা ভাষা ব্যবহারে উচ্চ আদালতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। বিশেষ করে সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলাই আছে। তাই উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার কোনো অযৌক্তিকতা নেই। সেই তিনটি আর্টিকেল পড়ে আমার মনে হয়েছে, এখনই সময়। আমি বাংলায় রায় দিলাম। অর্থাৎ বাংলায় রায় না দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২০০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রথম বাংলায় রায় দেয়া শুরু করি। হাইকোর্টে আমি ১৫০-২০০ রায় দিয়েছি। এর পর থেকে কোনো রায় বাংলায় দিয়েছি। তবে ছোট ছোট আদেশগুলো ইংরেজিতে দিয়েছি। এটা হয়ত আমার ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা। এই কারণে আদেশগুলো আমি ইংরেজিতে দিতাম। তবে রায়গুলো আমি বাংলায় দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় রায় দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায়। কারণ ইংরেজি যেসব শব্দ আমরা ব্যবহার করি তার পরিপূর্ণ প্রতিশব্দ অনেক সময় পাওয়া যায় না। আপীল বিভাগে আমি দুটি রায় বাংলায় দিতে পেরেছি। সিভিল সার্ভিসের কোটা নিয়ে বিরোধ সংক্রান্ত রায় আমি আপিল বিভাগে বাংলায় দিয়েছি। সম্ভবত এই রায়ই সর্বপ্রথম আপিল বিভাগে বাংলায় দেয়া হয়েছে। এরপর ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়টিও আমি বাংলায় দিয়েছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এ মামলার রায়টি বাংলায় লেখার কারণেই আমার বেশি সময় লেগেছে। এরপরও আমি চেয়েছি, ইংরেজির পরিবর্তে বাংলায় লিখলে সাধারণ মানুষ রায় পড়তে পারবেন। সহজে তারা অনুধাবন করতে পারেন রায়ের মর্মার্থ।

আসলে, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধা নেই। যেখানে সংবিধান বলে দিচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা সেখানে বাধা থাকার কথা নয়। অন্য যেকোনো আইনে যদি বিপরীত কিছু থাকে সেই আইনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে যা বলা আছে সেভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাই অন্য যেকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন সংবিধানে যেহেতু বাংলা বলা আছে তাই বাংলা ব্যবহারে আইনগত বা নৈতিক কোনো বাধা নেই। আর আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের এখানে বিরোধ নিষ্পত্তি বাংলা ভাষাতেই হবে এটা স্বাভাবিক। যেটা সমস্যা হচ্ছে বাংলায় লিখতে গেলে শব্দ


www.pathagar.com

চয়ন করতে গেলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। তবে এটা ধীরে ধীরে ঠিক হবে বলে আশা করা যায়। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের একটি প্যারা লক্ষ করা যেতে পারে। তিনি লিখেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের মতো স্বাস্থ্যদায়ক বলে একাধিকবার বক্তব্য রাখেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। দূরদেশি ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র। কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। মহাত্মা গান্ধীর মতে, নিজের মাতৃভাষাকে ছোট করা মানে নিজের মাকে ছোট করা। গান্ধী বলেছিলেন, যখন তিনি ইংরেজি বলেন, তখন তাঁর মনে হয় আমি একটা পাপ করেছি।' বিচারপতি হাবিবুর রহমান আরো লিখেন, 'যে-ভাষায় বিচারকর্ম সমাধা হয় না, সে-ভাষা বল সঞ্চার করে না, দুর্বল হয়ে থাকে। বাক্যগঠন ও বাক্যবিন্যাসে সে-ভাষায় ঋজুতা, দৃঢ়তা, নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার অভাব দেখা দেয়। আইন ও বিচারকার্যে ব্যবহারের ফলে একটি ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ইংল্যান্ডে বিচারকর্মে নরম্যান-ফ্রেঞ্চ ভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজির প্রচলন ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শেক্সপিয়ারের যুগে নাট্যশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র যুগপৎ ঋদ্ধি লাভ করে। নিজেদের ভাষার কল্পিত দৈন্যের অজুহাতে অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আমাদের ভাষার দৈন্যমোচনের প্রথম পদক্ষেপটাই হবে আদালতে সেই ভাষার প্রচলন, সে-ব্যবহার তেমন দক্ষহস্তে না হলেও।'

জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও নেদারল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষায় উচ্চ আদালতে বিচার কাজ চলে থাকে। সেদেশের বিচারপ্রার্থীরা যেন মামলার শুনানি ও রায় বুঝতে পারেন সেজন্য উচ্চ আদালতের সওয়াল-জবাব, রায় ও আদেশ দেওয়া হয় তাদের মাতৃভাষায়।

আমি অপেক্ষায় আছি, সব বাধা অতিক্রম করে উচ্চ আদালতে বাংলার পুরোপুরি ব্যবহার কবে হবে, সেই দিনের দিকে। তবে, আমি নিশ্চিত, আপিল বিভাগ ও হাইকোর্টে বাংলায় রায় দেয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। কারণ, বিচারকগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ দেখেছি। তারা সব সময় দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। বাংলার পুরোপুরি ব্যবহারের দিনটি হবে আমার জন্য স্মরণীয়।

• লেখক : বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি


www.pathagar.com

# আমাদের সংবিধান একদম মেইড ইন বাংলাদেশ

কামাল হোসেন

১৯৭১ সাল ২৮ শে ডিসেম্বর আমাকে হরিপুর জেল থেকে পুলিশ একাডেমির ছোট ডাক-বাংলো শিয়ালা একাডেমিতে নেয়া হলো। সেখানে দেখলাম, বঙ্গবন্ধু এক নম্বর কক্ষে আছেন। ওখানে ঢুকলেই তিনি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেরি হলো কেন? তোমাকে তো বলেছিলাম, পরশু ভুট্টোকে পাঠিয়ে দিতে।' আমি বললাম, বলার সাথে সাথে এক ঘণ্টাও লাগেনি, রেডি হয়ে গেছি আসার জন্য। অনেক কথার মধ্যে বললাম, দ্রুত বাংলাদেশ যাওয়া দরকার। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজিজ আহমেদ ওখানে আসতেন। আমাকে তখনই তিনি বলেছেন, ওর সঙ্গে কথা বলো। তখন আমার একটাই দাবি যত দ্রুত বাংলাদেশ যাওয়ার। বলছে, যে, পিআইএ'র ফ্লাইট ভারতের ওপর দিয়ে উড়তে পারে না, সম্ভব নয়। বললাম, যে কোনো তৃতীয় দেশ হয়ে যাব। তখন অন্যান্য দেশের নাম বললে বঙ্গবন্ধু বললেন, বলো, নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া। তারা বললো যে, আমরা লন্ডনে নিয়ে যেতে পারি। বঙ্গবন্ধু বললেন, লন্ডন মেনে নাও। আমাদের অনেক লোক এখানে মুক্তিযুদ্ধের কাজে নিয়োজিত ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সেখানে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলি লন্ডন যাব। লন্ডনে যাওয়ার কথা যখন হলো, গরম কাপড় নেই। বঙ্গবন্ধু বললেন, ঠিক আছে, আমার কোটটা তুমি পরতে পার।

লন্ডন হয়ে ১০ জানুয়ারি দেশে আসলাম। বঙ্গবন্ধুর কোট ঢাকা পর্যন্ত আমার কাজে লাগল। বঙ্গভবনে আমরা আনন্দ উল্লাস করছি। তখন হোস্টেলের মতো ছিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সবাই উপস্থিত। হোস্টেলের মতো, কেউ ফ্লোরিং করছে, ঘুমাচ্ছে। বড় বড় ডাইনিং টেবিলে বসে সবাই খাচ্ছেন।

১১ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদের হেয়ার রোডের বাসায় কেবিনেট মিটিং হচ্ছে। আমাকে ডাকা হয়েছে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার


www.pathagar.com

আমীর উল ইসলাম ও আমি গেছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেছি, সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরতে চাই। ওখানে বসে খসড়া করেছি, প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন। রুহুল কুদ্দুসকে বঙ্গবন্ধু বললেন, তখনই বিজি প্রেসে পাঠিয়ে দিতে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, কাল মন্ত্রিপরিষদ গঠন হবে। আবু সাঈদ চৌধুরীকেও বললেন, আপনি কাল থেকে প্রেসিডেন্ট। বলেন কি? না, আপনি প্রেসিডেন্ট। কাল শপথ হবে। নতুন কেবিনেট ঘোষণা করব, বললেন বঙ্গবন্ধু। শপথের জন্য প্রধান বিচারপতি লাগবে। বঙ্গবন্ধু বললেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি অ্যাডভোকেট কামরুদ্দীন আহমেদকে প্রধান বিচারপতি করার। তিনি ৫৪ এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় সমন্বয়ক ছিলেন। ভালো আইনজীবী ও রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। তাকে সবাই সম্মান করতাম। অনেক জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তার বাসায় বৈঠক ডাকা হতো। আমরা যেতাম। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক খান সরওয়ার মুরশিদও যেতেন। কামরুদ্দীন আহমেদ এসব বিষয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন। আমি তাকে ফোন করলাম, বললাম, বঙ্গবন্ধু বলছেন, আপনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন, কাল থেকে কোর্ট বসাব। তিনি আবেগের সঙ্গে বললেন, 'দেখ, কামাল, তোমরা আমাকে মনে রেখেছ। বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব দিচ্ছেন, আমি খুব গর্বিত। কিন্তু দেখ আমার ছেলে (৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধার ডেপুটি কমান্ডার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রনেতা নিজাম উদ্দিন আজাদ) মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। ছেলের শহীদ হওয়ার বিনিময়ে প্রধান বিচারপতি হবো, এটা মেনে নিতে পারিনা।' বঙ্গবন্ধু ফোন নিয়ে বললেন, 'আপনি এভাবে একদম চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলের বিনিময়ে প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন- তা মনে করবেন না। কামরুদ্দীন হিসেবে আপনার ভূমিকার জন্য, এ পদে আপনার চেয়ে যোগ্য কেউ নেই বলে আপনাকে প্রস্তাব দিচ্ছি।' বললেন, 'না, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কোনো পদে থাকবনা। যে কোনো কাজ চান করে দেব।'

১২ জানুয়ারি বঙ্গভবন থেকে বের হতে হতে বঙ্গবন্ধু আমাকে ডাকেন, এই, ভালো কাপড় পরে আজকে শপথ অনুষ্ঠানে এসো। বন্ধু থেকে কাপড় নিয়ে পরে আসলাম। বঙ্গবন্ধু বলেন, শপথ গ্রহণ নয়, তোমাকে কিন্তু শপথ নিতে হবে। আমি এটার জন্য অপ্রস্তুত ছিলাম। শপথ অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে গিয়েছিলাম। মাত্র দেশে এসেছি, আনন্দ উল্লাস করছি। স্বাধীন বাংলাদেশে পা ফেলেছি। ওই অবস্থায় আমাকে শপথ নিতে হলো আইন মন্ত্রী হিসেবে। বঙ্গবন্ধু বললেন, তোমাকে সংবিধান প্রণয়নের কাজে গুরুত্ব দিতে হবে।


www.pathagar.com

সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি হওয়া আমার কাছে অবাক লেগেছে। বঙ্গবন্ধুকে বলেছি, আমার ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বামে তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান, মনসুর আলী বসবেন। আমাকে দলে কর্মী হিসেবে নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অভিজ্ঞতা, বয়স ও দলের সিনিয়রিটি সেরকম অবস্থান নেই।

বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি যেহেতু আইনমন্ত্রী, এটা আইনের কাজ। আইনের ব্যাপারে তুমি তাদের সহযোগিতা করবে। সেটা তো ১০০ বার করব। তারা মেনে নিচ্ছেন, তুমি এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলনা। আমাদের শুধু চিন্তা ছিল, দেশের কাজ। কাজ দাও, আদায় করে নাও।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের কি যে উদারতা, বঙ্গবন্ধু কাজ দিয়েছেন, সবাই মিলে করছি। এটা আমাদের আনন্দ। রাত ১/২টা পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের কাজ করেছি। সংবিধানের কাজ করে রাতে বিজি প্রেসে পাঠিয়ে দিতাম। পরদিন সকালে সংশোধনী ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিত। স্টাফ, ড্রাইভার, পিয়নরা বলে যে, ওভার টাইম নেবেনা। প্রুফ দেখতে বিজি প্রেসে গেছি, ম্যানেজার বলছে, 'দেখেন, মানুষ দেশপ্রেমের তাগিদে সারারাত কাজ করছে। ওভারটাইম নেয়ার প্রশ্ন উঠেনা, দেশের কাজ।' সংবিধান প্রণয়নের কাজে সহযোগিতা করতে বৃটিশ পার্লামেন্টের এক ড্রাফটসম্যান এসেছিলেন, তিনি বললেন, বৃটিশ পার্লামেন্টে আমরা এটা পাইনা। সারারাত বসে এভাবে কাজ করবে, পরের দিন সকালে পাঠিয়ে দেবে।

## সংবিধান প্রণয়নে যেসব বিষয় বিবেচনায় থাকে

সংবিধান প্রণয়নের সময় ১৯৪৭ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি বৈষম্য ও শোষণের কথা আমাদের মাথায় ছিল। চার মূলনীতি–ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা, গণতন্ত্র (পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার পরও আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিলাম), সমাজতন্ত্র, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, শোষণমুক্ত সমাজ, আত্মবিকাশের সমান সুযোগ, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সবাই পাবে।

ভাষা আন্দোলন ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে চেষ্টা হয়েছিল। আমরা বাঙালী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কাজে লাগিয়ে বিভক্তি সৃষ্টি করা। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ তুলে দেয়া হলো। ৫০-এর দশকে আমরা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হয়েছি। ষাটের দশকে চেষ্টা হয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে তারা বিভাজন সৃষ্টি করতে পারেনি।


www.pathagar.com

আমাদের সংবিধানে সবচেয়ে বড় বিধান, যাতে আমরা দ্রুত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হই, জনগণ ক্ষমতার মালিক। সপ্তম অনুচ্ছেদে এটা যে কত বড় পাওয়া, জীবন দিয়ে শহীদরা এটা দিয়ে গেছেন। আমরা মাথা উঁচু করে বলি, এদেশের মালিক। মানুষ যুদ্ধ করে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। জনগণের ক্ষমতার মালিক হওয়ার কারণেই শাহবাগে আমরা দেখেছি, তাদের দায়িত্ব বোধের পরিচয়। এই চেতনা একাত্তরে দেখেছি।

সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ৯ মাস নয়, ২৪ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বিষয় বেরিয়েছে। মৌলিক অধিকার, আইনের চোখে সকলেই সমান। পশ্চিমাদের কাছে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছিলাম। ইত্তেফাক, সংবাদকে তারা বাজেয়াপ্ত করেছিল। কোথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আমাদের নেতাদের বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। সে কারণে বলেছিলাম, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখার আইন হবে না। এগুলো লিখতে কোনো সময় লাগেনি। সব ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল।
জনগণ ক্ষমতার মালিক, নির্ভেজাল গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ চেয়েছিলাম আমরা। সংসদকে আমরা অনেক ক্ষমতা দিয়েছি। এটার প্রয়োগ হচ্ছে না। তদন্ত করা। মার্কিন সিনেটে তারা কিভাবে মন্ত্রীদের নাজেহাল করে, উত্তর দাও। এটা কেন হয়নি, ওটা কেন হয়নি। এসব ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম। স্থানীয় সরকারের বিধান করেছিলাম। তখন ভাবতাম, সব ক্ষমতা কেন্দ্রে চলে গেলে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্যের জন্য রাজধানীতে গিয়ে তদবির করা লাগে। সকল স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা থাকবে। আইডিয়া যে, স্থানীয় সরকার কার্যকরভাবে থাকবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এসব লিখেছিলাম।

স্বাধীনতার স্বপ্ন লিখিত আকারে দেখতে চাইলে আশা করব, বাহাত্তরের সংবিধানে পাবে। এটাতো আজকে আমাকে বলে, আমাদের একই স্বপ্ন ছিল।

সংবিধান প্রণয়নের সময় কোনো একটি দেশের নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লিখিত সংবিধানের ভাষা কিছু কিছু নিয়েছি। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান। মূল কাঠামো দাঁড় করাই, ক্ষমতার মালিক, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এরপর অন্যদের কাছ থেকে নিতাম।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমার পাশে বসতেন। আমি ইংরেজিতে লিখতাম। তিনি বাংলা অনুবাদ করতেন। আলোচনা করে আসল অর্থ বের


www.pathagar.com

করতাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সংবিধানের খসড়া একদম মেইড ইন বাংলাদেশ। পাকিস্তান আমলে ৬ দফার ভিত্তিতে আমরা সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছিলাম। বলা হয়েছিল, দ্রুত পাঠাতে হবে। ২২ শে মার্চ ইয়াহিয়া ক্ষমতা নিল। ৭০ এর নির্বাচনের পর সংবিধান নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম। আমরা আগে থেকেই পূর্ণাঙ্গ সংবিধান নিয়ে কাজ করতাম।

৩ সার্কিট হাউজ রোডে আমার বাসায় বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন আহমদ চলে আসতেন, লাইন বাই লাইন পড়তেন। তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতেন। কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট করতে বলতেন। বঙ্গবন্ধুর প্রটোকলের বালাই ছিলনা। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় মুজিব ভাই। তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

৪ঠা নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনে অসাধারণ অনুভূতি ছিল। শহীদদের স্বপ্নের দলিল করেছি। ২৪ বছর আগে সংবিধান করতে পারিনি। করতে গিয়ে ২৬ মার্চ করে ফেলল। শহীদদের জীবনের বিনিময়ে সংবিধান করার অধিকার পেলাম। ৯ মাসের যুদ্ধের ফসল হিসেবে সংবিধান করতে পারলাম।

আমাদের জীবনে অসাধারণ কিছু দিন এসেছে। স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি, সংবিধান করতে পেরেছি। স্বাধীনতার পর অনেক পেয়েছি। এগুলো জাতি পেয়েছে। ৫৫ হাজার বর্গমাইলের দলিল করতে পেরেছি, সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে দেয়া হলো। এর মালিকানা জনগণের।

বঙ্গবন্ধু যেভাবে সবাইকে দেশের কাজে নিয়োগ করলেন ও লাগালেন, ওই সুযোগ পাওয়ার পর জীবনের আর কিছু পাওয়ার নেই। স্বাধীন দেশের সংগ্রামে তার কর্মী হিসেবে ছিলাম।

৭৩-এর নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন চাইনি। কমনওয়েলথ ল' সম্মেলনে লন্ডন গিয়েছি। বঙ্গবন্ধু খুঁজেছেন। বললেন, তুমি কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেলে। বললাম, সম্মেলনে গেছি। কেন মনোনয়ন? আমি তো ভাবছি কাজ শেষ হয়ে গেছে। 'না, না, আমি তোমার ফরমে সই করে মনোনয়ন দিয়েছি', বললেন বঙ্গবন্ধু। এভাবে তিনি আমাদের মূল্যায়ন করেছেন ও কাজ দিয়েছেন। তার সন্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

- লেখক : বঙ্গবন্ধু সরকারের আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি এবং সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি


www.pathagar.com

# আইন পেশার ৪৬ বছরের শুরুটা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে

মওদুদ আহমদ

জীবনের লক্ষ্য কি? স্কুলের শিক্ষকরা যখনই এ রচনা লিখতে বলতেন, তখনই মনের অজান্তেই আইন পেশায় উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার কথা ব্যক্ত করতাম এবং লিখতাম। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হিসেবে যাঁদের নাম পরিচিত ছিল–এদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, চিত্তরঞ্জন দাশ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, লিয়াকত আলী খানসহ আরো অনেকেই ছিলেন ব্যারিস্টার। তখন থেকেই আমার মনে ব্যারিস্টার হবার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা জাগে। স্কুল ও কলেজ জীবন পেরিয়ে ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আমার সহপাঠী ছিল তারা সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে সিএসপি (সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান) হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়ে। সে সময় শিক্ষার্থীদের কাছে সিএসপি অফিসার হওয়াটাই ছিল সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সাবেক অর্থ মন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, মোকাম্মেল হকসহ অনেক মেধাবী সে সময় সিএসপি অফিসার হয়েছিলেন। এটাই ছিল ওই সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট সরকারি চাকরি। তখনকার প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব বহন করত এ কারণে যে এই চাকরিতে ছিল ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা। ব্রিটিশ প্রশাসনের আদলে একটি এক্সক্লুসিভ এলিট শ্রেণী হিসেবে এই সিএসপি আমলাদের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। প্রতিবছরই ২০/২২ জন সিএসপি অফিসার নিয়োগ করত সরকার। বাঙালি ছেলেরা অসম্ভব ভালো ফল করত এই সিএসপি অফিসার নিয়োগের পরীক্ষায়। আমার ব্যাচের বন্ধুদের মধ্যে আনিসুজ্জামান খান, মনোয়ারুল ইসলাম, হাসনাত আব্দুল হাই, মনসুর আহমেদ, রশিদুল হাসানসহ অনেকে সিএসপি অফিসার হিসেবে যোগদান করেছিল ।

পরিবারের প্রায় সকলেই চেয়েছিলেন আমি যেন সিএসপি অফিসার হই। কিন্তু আমার পিতা আমাকে পেশা বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা


www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। আমি ১৯৬০ সালে এমএ পাস করার পর ১৯৬১ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে ভর্তি হই। পাশাপাশি লিংকন'স ইনএ' ও ভর্তি হই। যেহেতু ইচ্ছা ছিল ব্যারিস্টার হব সেহেতু স্কুল অব ইকনমিকসে বাড়তি আর কিছু পড়ার কোন প্রয়োজনবোধ করিনি। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেনের লিংকন'স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করি। সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে সনদ লাভ করি এবং তার পরের বছর থেকে ঢাকা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করি।

ব্যারিস্টারি পড়ার সময় লন্ডনে আমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনের সম্পাদক ছিলাম। তাছাড়া ওই সময়ে কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আইয়ুব খান যখন লন্ডনে গিয়েছিলেন তখন আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করি। এ দুটি কারণে আমার দেশে ফিরতেও বিলম্ব হয়। দেশে এসেই প্র্যাকটিস শুরু করার পর প্রথম যে মামলাটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হই তা ছিল, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। পাকিস্তান সরকার তখনও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করেনি। সময়টা ছিল ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস। এ সময়ে সুলতানউদ্দিন ও কামালউদ্দিনকে আটক করে পাকিস্তান সরকার। এরা দুজনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। এই দুজনসহ ২৮ জনের একটি তালিকাও প্রকাশ করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। আটককৃত সুলতানউদ্দিন ও কামালউদ্দিনের ওপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। তাদের মুক্তি ও জীবনরক্ষার জন্য হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস রিট করি। ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামসহ আমরা ক'জন ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে এই রিট আবেদনটি হাইকোর্টে দায়ের করি। শুনানি গ্রহণ করে হাইকোর্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিয়ে তাদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টে হাজিরের পর দেখা গেল সত্যিকার অর্থেই তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। পরে আদালত প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনার ১০/১৫ দিন পর পাকিস্তান সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একই মামলায় আরো সাতজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে। এই সাতজনের মধ্যে এক নম্বরে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তির পর এই মামলার গুরুত্ব অনেকাংশেই বেড়ে যায়। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই ৩৫ জন একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। সেই থেকে মামলাটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। তখন থেকেই আমি এই মামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হই।


www.pathagar.com

আমরা ধারণা করেছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানসহ সবাইকে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বিচারে তারা দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসি দেয়া হবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য ১৯৬২ সালে লন্ডনে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' আন্দোলন করার পর দেশে ফিরে এসেই এই ধরনের একটি মামলার সম্মুখীন হলাম। আমি তখন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু আইনজীবী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা দায়ী থেকে যাব এই অনুভূতি থেকে আমরা চারজন ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন (সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি), ব্যারিস্টার কে, জেড আলম শেলী (বর্তমানে প্রয়াত), ব্যারিস্টার আবুল খায়ের খান (হলিডে পত্রিকার প্রথম প্রকাশক) ও আমি একদিন সন্ধ্যার পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতাই কারাবন্দি অবস্থায় ছিলেন। যারা বাইরে ছিলেন তারা সবাই ভয়ে বা যে কোন কারণেই হোক আত্মগোপনে থাকতেন। আওয়ামী লীগের যেসব আইনজীবী ও নেতৃবৃন্দ জনসম্মুখে ছিলেন তারা এই মামলা পরিচালনা বা এর সঙ্গে যুক্ত হতে বা ওকালতনামায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। আমরা যখন বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করি তিনি বিস্মিত হলেন যে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত চারজন ব্যারিস্টার তার স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য দেখা করতে এসেছি। আমরা তাকে বলি, একজন ব্রিটিশ ব্যারিস্টারকে এনে আমরা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করতে চাই। তখন বেগম মুজিব নিজের চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারেননি। তিনি বললেন "আমার বাড়ির উপর দিয়ে এখন কাউয়াও (কাকও) ওড়ে না, যারা সচরাচর এ পথে চলাচল করেন, তারা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে না গিয়ে এখন অন্য রাস্তা দিয়ে যায়। আমি তো আপনাদের চিনি না।" আমরা আবারো তাকে আশ্বস্ত করলাম যে আপনি অনুমতি দিলে একজন ব্রিটিশ আইনজীবীকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে আমরা অগ্রসর হব।

পরেরদিন আমরা দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক ও সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া অর্থাৎ মানিক ভাইয়ের কাছে যাই। তিনিও ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে থাকতেন না। মানিক ভাইকে বোঝানোর চেষ্টা করি, আমরা এই ষড়যন্ত্র মামলা লড়তে ইচ্ছুক। পরেরদিন আমাদের নিয়ে তিনি শেখ সাহেবের বাসায় গেলেন এবং বেগম মুজিবকে এ বিষয়টি পুনরায় অবহিত করে বললেন এটি করা গেলে শেখ মুজিবের জন্য ভালো হবে।


www.pathagar.com

আমি তখন কায়েতটুলীতে বাবা-মায়ের সঙ্গে বাস করি। একদিন রাত ১টার দিকে বেগম মুজিব এবং তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ খোকাকে নিয়ে আমার বাসায় আসলেন। তিনি আমাকে শেখ সাহেবের স্বাক্ষর করা ওকালতনামা দিয়ে যা কিছু সম্ভব করার জন্য বলে গেলেন।

ওকালতনামা পাওয়ার পর আমি লন্ডনে প্রবাসী ও বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বার্নাড সেরিডন বলে এক সলিসিটর ফার্মের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউসি এমপিকে সম্মত করালাম, যিনি এ ধরনের মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। গোপনে কিছু অর্থও তার জন্য বিদেশে পাঠালাম। মোল্লা জালালউদ্দিন ও সাবেক রাষ্ট্রদূত শামসুল হক এবং আমি মিলে চট্টগ্রাম থেকে এই টাকা পাঠালাম। ওই সময়ে হাইকোর্টের নামকরা আইনজীবী ছিলেন জনাব আব্দুস সালাম। তার নেতৃত্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য ১৯৬৭ সালে ডিফেন্স টিম গঠন করা হলো। জুন মাস নাগাদ আমার সিনিয়র টমাস উইলিয়ামস ঢাকায় আসলেন। এ ধরনের মামলা যে সাংবিধানিকভাবে চলতে পারে না, সেই আবেদন জানিয়ে রিট পিটিশন দাখিল করা হলো। সেই রিট আবেদনের শুনানি হলো পুরনো হাইকোর্ট ভবনে। প্রধান বিচারপতি ছিলেন জনাব বিএ সিদ্দিকী। টমাস উইলিয়ামস সপ্তাহ দুয়েক ঢাকায় ছিলেন। তার আগমন ও মামলা পরিচালনার কারণে এই ষড়যন্ত্র মামলা ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং এটা একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। মামলার প্রতিদিনের বিচারিক কার্যক্রম খবরের কাগজে বিস্তারিত প্রকাশ পাওয়ায় স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে জনমত আরও ব্যাপকতা লাভ করে। ১১ মাস যাবৎ মামলা চলার পর ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই মামলার জন্য আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি। এই মামলার শেষের দিকে আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি ছিলেন জেনারেল মুজাফফর আহমেদ। দেশে তখন উত্তাল অবস্থা বিরাজ করছিল। রাতে থাকতো কারফিউ। তখনকার রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য জেনারেল মুজাফফরের সহযোগিতায় ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম ও আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টে বেশ কয়েক রাতে দেখা করি এবং তার মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করি। একদিন শেখ সাহেব আমার হাত ধরে বলেছিলেন "আমার মুক্তির পর তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।" ১৯৬৯ সালের


www.pathagar.com

২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করে ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে আসেন। সেদিন থেকে তাঁর অবৈতনিক ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করেছি প্রায় দেড় বছর।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালানোর পর যুদ্ধে যোগদান করতে ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে গিয়ে দেখলাম মেজর খালেদ মোশাররফ ও নূরুল ইসলাম শিশুকে। তারা এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনী গঠন করার জন্য ক্যাম্প তৈরি করেছে এবং কিছু যুবককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ২৭ মার্চ বিকালের দিকে রেডিওতে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার কথা শুনে দারুণভাবে উজ্জীবিত হলাম। কলকাতার ৯, সার্কাস এভিনিউতে একজন নির্দলীয় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এক্সটার্নাল পাবলিসিটি ডিভিশন গঠন করি এবং ছোট একটি টিম নিয়ে কাজ শুরু করি। এই সেলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার চালানো। এই সেলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ নামে একটি ইংরেজি ভাষায় নিয়মিত বুলেটিন বের করি এবং প্রবাসী সরকারের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রতিবেদন তৈরি করতাম। আর বিদেশি সাংবাদিকদের যুদ্ধের বিষয়ে ব্রিফ করতাম। যুদ্ধের নয় মাসে আনুমানিক ২৫০ জন বিদেশি সাংবাদিককে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি ব্রিফ করি। মেহেরপুরের ছোট গ্রাম কেশবপুর মুক্ত ছিল। সেখানে একটি কুঁড়েঘরে বাংলাদেশের প্রথম ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। লন্ডন থেকে ডাক টিকেট ছাপিয়ে সেই পোস্ট অফিস থেকে প্রথম ডাক টিকেটের উদ্বোধন করা হয়। ব্রিটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টেন হাউস এমপি এবং ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ সেদিন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন আমি অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের প্রধান পোস্ট মাস্টার জেনারেল হিসেবে সম্মানিত হই।

এপ্রিল-মে মাসের দিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রচার অনেকটা থেমে যায়। বিদেশি সংবাদপত্রে লেখা শুরু হয়েছিল যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের মত অনেকদিন যাবৎ এই যুদ্ধ চলবে। সুতরাং সংবাদপত্রগুলোর কাছে এদেশের যুদ্ধ তেমন আর গুরুত্ব বহন করেনি। জুন মাসে যখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয় তখন কলকাতার আশে-পাশে বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু যারা শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে নিদারুণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। একই সময়ে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি কলকাতার আশ-পাশের রিফিউজি ক্যাম্প দেখতে আসেন এবং আমি তার সাথে ছিলাম যখন তিনি সল্টলেকের বড় শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশের


www.pathagar.com

যুদ্ধের খবর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আবারো ভাটা পড়ে। আমি তখন আমার বন্ধু লন্ডন টাইমসের প্রখ্যাত সাংবাদিক পিটার হেইজেলহার্স্টকে ফোন করে কলকাতায় আসার অনুরোধ করি। কিন্তু সে আমাকে জানায় যে এই যুদ্ধ অনেকদিন চলবে। নতুন কোন সংবাদ নেই। এ পরিস্থিতিতে আমার সংবাদপত্রের সম্পাদক আমাকে কলকাতায় যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে তুমি যদি তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে পারো তাহলে আমি আমার সম্পাদকের কাছ থেকে অনুমতি পেতে পারি। "শুনেছি তাজউদ্দীন আহমদ নাকি রণক্ষেত্র থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন?" এরপর আমি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের (তাজউদ্দীনের প্রধান সহায়তাকারী, প্রিন্সিপ্যাল এইড টু পিএম) হিসেবে থিয়েটার রোডে কাজ করছিলেন। আমি তাকে পিটারের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি ফোনে জানানোর পর ঠিক করা হলো তাজউদ্দীন সাহেব রণাঙ্গনে পিটার হেইজেলহার্স্টকে সাক্ষাৎকার দেবেন। পিটার কলকাতায় আসার পরেরদিন ভোরবেলায় আমীর-উল ইসলাম তাজউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে মেহেরপুরের আম্রকাননের কাছে চলে গেলেন। আমি পিটারকে নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পরে রওনা হলাম। সেখানে কাঁচা মাটির একটি ছাউনিতে আমি ও পিটার অপেক্ষা করছিলাম, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাজউদ্দীন সাহেবকে মাথায় ক্যাপ পরিহিত ও হাতে রাইফেল নিয়ে গেরিলা পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসতে দেখা গেল। ওই ঘরের একটি চৌকিতে বসে তার সাক্ষাৎকার নিলেন পিটার। আমি ও ব্যারিস্টার আমীর বাইরে পাহারারত ছিলাম। প্রায় ৪০ মিনিট সেই সাক্ষাৎকার চলার শেষের দিকে দূর থেকে কামানের গোলার শব্দ পাওয়া গেল। এ অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদ তাড়াহুড়ো করে আবার রণাঙ্গনের দিকে চলে গেলেন। আমরাও সেখান থেকে ফিরে আসলাম। পরের দিন টাইমস-এর প্রথম পাতায় তিন কলাম জুড়ে ছবিসহ রিপোর্ট বের হলো। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশ লিডার ডিটারমিনড টু উইন দ্যা ওয়ার"।

সংগ্রাম, ত্যাগ ও লাখো প্রাণের বিনিময়ে একটি পর্যায়ে এসে যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলাদেশ। যুদ্ধের পর রচিত প্রথম বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে। এই সংবিধান ছিল একটি উন্নতমানের সংবিধান। ২৪ বছর যাবৎ দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়েছিল, তা বহুলাংশে এই সংবিধানে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতিসংঘের সনদে যে সমস্ত মৌলিক অধিকারের কথা


www.pathagar.com

বলা আছে তা সবই এই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো।

মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকে আমার সঙ্গে আগে যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল, স্বাভাবিক কারণে সেটি আর থাকে নি। যেহেতু আমি আওয়ামী লীগের কোন কমিটির সদস্য ছিলাম না, তাই তখনকার সরকারের সঙ্গেও আমার কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক থাকেনি। আমি তখন পুরোপুরিভাবে নিজেকে আইন পেশায় নিয়োজিত করি এবং দ্রুত এ পেশায় উন্নতি লাভ করি। তবে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের আইনজীবী হিসেবে কাজ করিনি। আমার সমস্ত মক্কেল ছিল প্রাইভেট সেক্টর অর্থাৎ বেসরকারি খাতের।

এবার আসি রক্ষী বাহিনী প্রসঙ্গে। সরকার ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ এক আদেশ জারি করে রক্ষী বাহিনী গঠন করে। সেনাবাহিনীকে অবমূল্যায়ন ও অবহেলা করে একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয় রক্ষী বাহিনীকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ক্রমশ রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নে অর্থাৎ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে দেশের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে আমরা জাতীয় প্রেসক্লাবে বসে "মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি" (কমিটি ফর সিভিল লিবার্টিজ এন্ড লিগ্যাল এইড) গঠন করি। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন কবি সিকান্দার আবু জাফর। এই কমিটি গঠনের সঙ্গে হলিডে সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান ও মির্জা গোলাম হাফিজসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পেশাজীবী-রাজনীতিকরা জড়িত ছিলেন। আমি এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হই। তখনকার সময়ে রক্ষীবাহিনী কোনো ধরনের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সরকার-বিরোধী হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। একজন আইনজীবী হিসেবে রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৫০০ মামলা হাইকোর্টে পরিচালনা করি। যাদের মামলা পরিচালনা করি, তাদের বেশিরভাগই ছিল জাসদের নেতা-কর্মী এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। তারপরও যে কয়েকটি মামলা আমাদের আইনের জগতে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তাদের মধ্যে একটি হলো রাষ্ট্র বনাম শাহজাহান মামলা। শাহজাহান ছিল জাসদের কর্মী। তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে রক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। শাহজাহানের পক্ষে হেবিয়াস কর্পাস রিট পিটিশন ফাইল করি। সিপিডির নির্বাহী প্রধান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের পিতা বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ওই রিট পিটিশনের শুনানি হয়। এই মামলায়


www.pathagar.com

বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি রক্ষীবাহিনীর তিনজন কর্মকর্তাকে হাইকোর্টে তলব করে আমাদেরকে জেরা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। জেরার এক পর্যায়ে বেরিয়ে আসে যে রক্ষীবাহিনীর কোনো কোড অব কনডাক্ট নেই। থানা থেকে কোনো গুলি ও বন্দুক নেয়া হলেও তার কোনো হিসেব রক্ষীবাহিনীকে দিতে হতো না। তাই তারা নির্বিচারে অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যেত। হাইকোর্টে জেরার এক পর্যায়ে রক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানায়, পুলিশের কাছ থেকে শাহজাহানকে তাদের হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার পর মিরপুরের বধ্যভূমিতে লুক্কায়িত অস্ত্র দেখানোর কথা বলে পালিয়ে যায় শাহজাহান। আদালত এই বক্তব্য গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কারণ রক্ষী বাহিনী কোনো রেজিষ্ট্রার মেইনটেইন করত না এবং আদালতের বুঝতে বাকি রইল না যে, তারা শাহজাহানকে হত্যা করেছে। আদালত সরকারকে নির্দেশ দিলেন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করার জন্য এবং শাহজাহানের ঘটনায় যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। কিন্তু তৎকালীন সরকার এই তদন্ত কমিশন গঠনের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই মামলায় হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছেন, রক্ষীবাহিনী হয়তো আইনসম্মতভাবে গঠিত হয়েছে, কারণ আইনের মাধ্যমে এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এই বাহিনী পরিচালিত সকল কার্যক্রম বেআইনি ও অবৈধ।

রক্ষী বাহিনীর আরেকটি নির্যাতনের ঘটনার কথা বলছি, সেটি ছিল শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন, তাদের পুত্র চঞ্চল সেন, কন্যা ও পাশের বাড়ির হনুফা বেগমের। এদেরকে রক্ষীবাহিনী তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছে। তরুণী মেয়েদেরকে বস্ত্রহীন করে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে সিগারেট দিয়ে তাদের শরীরে ছ্যাকা দিয়েছে। আর অরুণা সেনের কোমরে দড়ি বেঁধে শীতের সকালে নদীতে ঠেলে দিয়ে পুনরায় নদী থেকে টেনে তোলা হয়েছে। এ ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত একটি আবেদন হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। হাইকোর্ট এক আদেশে নির্যাতিতদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। হাজিরের পর বিচারকরা খাস কামরায় ডেকে নিয়ে তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেন। বিচারকরা তাদের শরীরে অমানবিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখতে পান। ওইদিন হাইকোর্ট সকলকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিলেও সে সময় কারা ফটকের বাইরে থেকে রক্ষী বাহিনী ফের ধরে নিয়ে যেতে পারতো। সেই কারণে শান্তি সেনের পরিবারের সদস্যদের জীবন রক্ষার জন্য এনায়েতউল্লাহ খান, বদরুদ্দীন উমরসহ আমরা তাদেরকে কারা ফটক থেকে নিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি।


www.pathagar.com

আজ প্রায় ৪৬ বছর হলো আমি সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করছি। নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য অতীতের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য এখন আর দেখা যায় না। নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগের আবির্ভাব। কিন্তু আমরা সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। নিম্ন আদালতে বিচারকদের বদলি, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে দলীয় চিন্তাধারার অগ্রাধিকার, সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগে দলীয়করণের চরম প্রবণতা এবং নিম্ন ও উচ্চ আদালতে সরকারি হস্তক্ষেপ ও প্রভাবের প্রবণতা বৃদ্ধি। উপর্যুক্ত কারণে বিচার বিভাগের উপর জনসাধারণের যে বিশ্বাস ও আস্থা ১০ বছর আগেও যা ছিল, এখন আর তা নেই। এখন বিচারকরা মুক্তমনে নিজেদের শিক্ষা, জ্ঞান ও বিবেক অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারছেন না। ভালো ভালো অনেক বিচারক আছেন; কিন্তু তাদেরকে রিট পিটিশন বা মোশন শুনানির বেঞ্চ না দিয়ে জুনিয়র বিচারকদের সেই সব বেঞ্চে কাজ করার ব্যবস্থা করা হয়। একটা রুল ইস্যুর ব্যাপারে আগে একটা নিয়মিত ব্যাপার ছিল যে, যদি কোন আবেদনে আবেদনকারী তার অধিকার লঙ্ঘনের প্রাথমিক যুক্তি উপস্থাপন করতে পারতেন তাহলে আদালত এককভাবে সেই বিষয়ে রুল ইস্যু করতেন। কিন্তু এখন রুল ইস্যু করার আগেই রাষ্ট্রপক্ষকে শোনার সুযোগ দেয়া একটি নিয়মিত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ঘণ্টাকাল নয়, এমনকি ২/৩ দিন তর্ক-বিতর্কের সুযোগ দেয়া হয় দুই পক্ষকে শুধু রুল ইস্যু করার আগেই–যা আগে ছিল অকল্পনীয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের কোন মামলা, এমনকি কেবল জামিনের ক্ষেত্রেও একই খারাপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাটা বর্তমানে একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারের দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অতীতে বিচার বিভাগ নাগরিককে জুলুমের হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে যে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন সেই ভূমিকা এখন আর সেভাবে দেখা যায় না। আপীল বিভাগ একটি রায়ের মাধ্যমে আগাম জামিনের অধিকার অনেকটা সীমিত করে দিয়েছেন। দীর্ঘকাল থেকেই বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে যে মামলা মোকদ্দমার সম্মুখীন হয় তা থেকে রক্ষা পেতে হাইকোর্টে এসে তারা আগাম জামিন লাভ করতেন। আগাম জামিন দিয়ে স্থায়ী জামিন কেন দেয়া হবে না, এই মর্মে রুল জারি করতেন। মামলার পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্ব পর্যন্ত এ জামিনের মেয়াদ থাকত। অনেক সময় আদালত


www.pathagar.com

সময়ও বেঁধে দিতেন। এখন একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে জামিন প্রার্থিত ব্যক্তিকে নিম্ন আদালতে হাজির হতে বলা হয় আর নিম্ন আদালতে হাজির হলে সে যদি বিরোধী দলের নেতা-কর্মী হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। বিরোধী দলের শীর্ষ কয়েকজন নেতা এবং সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটেছে। আপীল বিভাগ এক রায় দিয়ে আগাম জামিনের এই পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের দমন পীড়নের পথ আরও সুগম করে দিয়েছেন।

বিচার বিভাগ বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের অতীতের ঐতিহ্য, সম্মান এবং মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দুর্নীতির পথগুলো বন্ধ করার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য যিনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। তিনি চাইলে বিচার বিভাগের ঐতিহ্য, মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও নিরপেক্ষতা আবার ফিরিয়ে আনতে পারেন।

• লেখক : সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী
অনুলিখন: দিদারুল আলম, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক


www.pathagar.com

# স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণাপত্র যেভাবে লিখলাম

এম আমীর-উল ইসলাম

১০ এপ্রিল বিভিন্ন অঞ্চল সফরের জন্য আমাদের বের হবার কথা রয়েছে। একটি ছোট্ট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। বিমানটি খুব নিচু দিয়ে উড়তে পারে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। মনসুর ভাই (এম মনসুর আলী) কামরুজ্জামান ভাই (এএইচএম কামরুজ্জামান) ও তোফায়েল আহমেদ একই বিমানে আমাদের সাথে যাবেন। পরদিন খুব ভোরে গাজা পার্কের বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই-এর সাথে দেখা করে তাঁকে বিস্তারিত সব কিছু অবহিত করি।

তাঁর সাথে বলতে গেলে আমার আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রাণখোলা সহজ-সরল মানুষ। দু'জনে একান্তে প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মনের জমাট মান-অভিমান দূর হয়ে গেল। বিপ্লবী পরিষদ গঠনের জন্য যুবকদের প্রস্তাব যে অযৌক্তিক ও অবাস্তব এবং এটা যে যুদ্ধের সহায়ক হবে না তাও তিনি মেনে নিলেন। তাজউদ্দিন ভাই (তাজউদ্দীন আহমদ) এর অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার আর কোন আপত্তি রইলো না। আমাদের সাথে বিমানে আগরতলা যাওয়ার জন্য কামরুজ্জামান ভাইকে বললাম। তিনি বলেন, যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না। তিনি খবর পেয়েছেন, তার পরিবার পরিজন কোলকাতার পথে দেশ ত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তার এখানে থাকা প্রয়োজন। আমি খুশি মনে বিদায় নেই।

১০ এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওয়ানা হওয়ার কথা। তাজউদ্দীন ভাই মনসুর ভাই, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আমি লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমানবন্দরে যাই। অন্যান্যের মধ্যে মিঃ নগেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গী হলেন। বিমানটি খুবই ছোট। এতে বসার মত ৫/৬ টি



www.pathagar.com

আসন ছিল। খুব নিচু দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি অব্যবহৃত বিমানবন্দরে আমরা নামি। এগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। ছোট ছোট বিমান বন্দরগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। একটি বিমান বন্দরে আমরা দুপুরের খাবার খাই। বিএসএফ-এর মাধ্যমে খবর দেয়া হলো কোন আওয়ামী লীগ নেতার খোঁজ পেলে পরবর্তী কোন বিমানবন্দরে তৈরি রাখতে।

উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোন নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। এদের বেশির ভাগ কালকাতা এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগডোগরা বিমান বন্দরে নামি। সেখানে থেকে জীপে করে শিলিগুড়ি যাই। শহর থেকে অনেক ভেতরে সীমান্তের খুব কাছাকাছি একটি বাংলোতে উঠলাম। গোলক মজুমদার এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এখানের কোন একটি জঙ্গল থেকে গোপন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দীন ভাই-এর বক্তৃতা প্রচারিত হবে। এ সময় তোফায়েল আহমেদ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেখ মনি বলেন, তোফায়েলের কলকাতা যাওয়া দরকার। শেখ মনি কিছু নির্দেশসহ তোফায়েল আহমেদকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

মনসুর ভাই-এর জ্বর এসে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসে আছি। তার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়ে তার সাথে আলাপ করলাম। তিনি মত দিলেন তাজউদ্দীন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। এরপর মনসুর ভাই বা কামরুজ্জামান ভাই প্রধানমন্ত্রীর পদের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন তোলেননি।
পাঁচজন নেতার মধ্যে তিনজনের সাথে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন ভাই-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে কোন আপত্তি করবেন না। তাছাড়া তাকে উপ-রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকি রইলো খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন।

তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজী করানো যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন ভাই এর প্রথম বক্তৃতা প্রচার করার পালা। তাজউদ্দীন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেয়া হলো। শেখ মনি


www.pathagar.com

তাজউদ্দীন ভাই-এর সাথে একান্তে আলাপ করতে চাইলেন। আমি বাইরের ঘরে বিএসএফ-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তার সাথে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা ও শত্রুদের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করলাম।

শেখ মণির সাথে কথাবার্তা শেষে তাজউদ্দীন ভাই আমাকে ডাকেন। তিনি জানান, শেখ মনি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজী নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এমপি, এমএনএ ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মনি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা করা না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আমি সরকার গঠনের পক্ষে আবারো যুক্তি দিলাম। আমি বললাম, সরকার গঠন করতে বিলম্ব হলে সংকট আরো বাড়বে এবং এতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া সরকার গঠনের পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়।

মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দীন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমেদের তখনো দেখা নেই। তাঁরা কোথায় কি অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকারকে আমরা আশ্বাস দিয়েছি। তাতে বিলম্ব হলে আমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহ পোষণ করবেন। আমাদের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে কোন অবস্থাতেই তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত নয়।

ভারত সরকারও জানেন, আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচারিত হবে। আমার এসব কথা শেখ মনি মানতে রাজী নন। বেশি করে বুঝাতে চাইলে শেখ মনি জানান তারা বঙ্গবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এ সময় তাজউদ্দীন ভাই আমাকে বলেন, আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা হবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাকে যথাসময়ে জানানো হবে।

গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে আজ বক্তৃতা প্রচার করা হবে না। এ কথা শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলম্ব করা কি ঠিক হবে? তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব কিছু ঠিকঠাক সে মুহূর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে, তা আমরা ভেবে দেখেছি কিনা। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌঁছে গেছে।


www.pathagar.com

আমি গোলক মজুমদারকে বললাম ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। রেডিও অন করে রেখে শুনতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দীন ভাই ও শেখ মনি আছেন। রাত তখন সাড়ে ন'টা। সেই আকাঙ্ক্ষিত বক্তৃতা আসলো। প্রথমে আমার কণ্ঠ ভেসে আসলো। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এখন বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হল। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। বক্তৃতা প্রচারিত হলো। আমাদের তিনজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি শুধু বললাম, গোলক মজুমদার শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা প্রচার বন্ধ করতে পারেননি। মনসুর ভাই রুটি খেয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনতে পাননি। পরে একক সিদ্ধান্তে বক্তৃতা প্রচারের জন্য তাজউদ্দিন ভাই-এর কাছে ক্ষমা ও শাস্তি প্রার্থনা করি। তিনি বলেছিলেন যে, সে সময় আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। সেদিন বক্তৃতা প্রচার না করলে গোলমাল আরো বাড়ত বৈকি। শেখ মনি তাজউদ্দীন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগরতলা গিয়ে সকল প্রকার উদ্যোগ নেবেন। কিন্তু আগরতলা গিয়ে শেখ মনি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবাতে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাড়িতে চলে যান। তাজউদ্দীন ভাই-এর বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামান ও আব্দুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনা করি। আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। ভোরের দিকে তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। তাদের অনেক কাজ। এক মুহূর্ত সময় নেই। যোদ্ধারা তাদের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সরকার গঠনে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১১ই এপ্রিল সকালে নাশতা করে আমরা বিমানে উঠি। আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর থেকেই শেখ মনি চুপচাপ রয়েছেন। বক্তৃতার কথা শুনে মনসুর ভাই উৎফুল্ল। রাতের বিশ্রামের পর মনসুর ভাই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মনসুর ভাই অবিশ্রান্তভাবে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কের অবসান হওয়ায় মনসুর ভাই যেন বেশি খুশি।

খুব নিচু দিয়ে আমাদের ছোট বিমান উড়ছে। দু'দেশের নেতাদের খোঁজখবর নিচ্ছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে খোঁজ করার জন্য


www.pathagar.com

ময়মনসিংহ সীমান্তে আমরা খবর দিয়ে রেখেছিলাম। সৈয়দ নজরুলকে পাওয়া যেতে পারে এমন একটি স্থানে গিয়ে প্রথমে শুনলাম, নেতৃস্থানীয় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে বিএসএফ-এর স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নিচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। এ কথা শুনে আমরা 'ইউরেকা', বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে তাঁরা দু'জন আসলেন। নজরুল ভাই জীপ থেকে প্রথমে নামেন। হুইপ আবদুল মান্নানকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে জানলাম ২৫ মার্চের পর থেকে মান্নান সাহেব কষ্টে দিনকাল কাটিয়েছেন। পাক বাহিনীর ভয়ে তিনি দু'দিন পায়খানায় পালিয়ে ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে সড়ক পথে হেঁটে ময়মনসিংহ এসেছেন। তিনি একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই ও তার ভাই শুনে উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দীন ভাই ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনা পরে তাকে অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। এই দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই উৎফুল্ল হই। আমরা আবার বিমানে উঠি, আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আগরতলা। আমরা বিমানে আসন গ্রহণ করি। সামনের আসনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর ভাই। নজরুল ভাই বিমানে বসে ঢাকা থেকে পালানোর কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি ডা. আলীম চৌধুরীর ছোট ভাই-এর বাসায় থাকতেন। তিনি ছিলেন নজরুল ভাই-এর আত্মীয়। সেই বাসা থেকে পরচুলা ও মেয়েদের কাপড় পরে গোপনে ঢাকা ছাড়েন। মনসুর ভাই এ কথা নিয়ে এমনভাবে ঠাট্টা করলেন যে বিমানে কেউ না হেসে থাকতে পারলেন না। আমাদের আগরতলা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌঁছেছেন। কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা হলো। তার চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত গোঁফ তিনি কেটে ফেলেছেন। প্রথমে তাকে চিনতেই পারছিলাম না। আমরা নিজেরও দাড়ি কেটে ফেলেছি। দু'জনেই দুজনকে ডেকে হাসি ঠাট্টা করলাম।

আগের রাতে খন্দকার মোশতাক এসেছেন। ড. টি হোসেন ঢাকা থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন। এম আর সিদ্দিকী কয়েক দিন আগে আগরতলা এসেছেন। চট্টগ্রাম থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী এবং সিলেট থেকে আবদুস সামাদও এসে গেছেন। তাছাড়া তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলী চাষী


www.pathagar.com

ছিলেন। আগরতলা সার্কিট হাউজের পুরোটা আমাদের দখলে। ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং ভিন্ন একটি ঘরে অবস্থান করছেন।

ওসমানী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা তৈরি করে ফেলেন। আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি এর পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেন। রাতে খাবারের পর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন। খন্দকার খুবই মনঃক্ষুণ্ন। নাটকীয়ভাবে তিনি বললেন, আমরা যেন তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেই। আর মৃত্যুকালে তার লাশ যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি ডঃ টি হোসেনের মাধ্যমে মোশতাক সাহেবের মনোভাব জানতে চাইলাম। মোশতাক ও টি হোসেন এর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। দু'জনেই এক জেলার লোক। পারিবারিক পর্যায়েও তাদের সম্পর্ক খুবই মধুর। তিনিই তাকে নিয়ে এসেছেন আগরতলায়।

টি হোসেনের সাথে আলাপ করে জানলাম মোশতাক সাহেব প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী। সিনিয়র হিসেবে এই পদ তারই প্রাপ্য বলে তিনি জানিয়েছেন। সারা রাত সলাপরামর্শ হলো। অনিদ্রা ও দীর্ঘ আলোচনায় আমি খুবই ক্লান্তি অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভায় থাকতে রাজি হলেন। তবে একটা শর্ত হলো তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে হবে। তাজউদ্দীন ভাই আমাকে একথা জানান। সবাই এতে রাজি হলেন। কেন না, একটা সমঝোতার জন্যে এই ব্যবস্থা একেবারে খারাপ নয়। অবশেষে খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়টির সুরাহা হলো। একজন হেসে খবর দিলেন, তিনি যোগদানে রাজি হয়েছেন। উপস্থিত সকলে এক থাকায় আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন। সকলে জহুর ভাইকে মোনাজাত করতে অনুরোধ করলেন। তিনি কয়েকদিন আগে হজ করে এসেছেন। তার মাথায় তখনো মক্কা শরীফের টুপি। তিনি আধ ঘণ্টা ধরে আবেগপ্রবণভাবে মোনাজাত পরিচালনা করেন। তার মোনাজাতে বঙ্গবন্ধুর কথা, পাক দস্যুদের অত্যাচার, স্বজন- মুক্তিযোদ্ধা দেশবাসীসহ শরণার্থীদের কথা এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেকের চোখে পানি এসে গেল। এই মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দীন ভাই ও আমার


www.pathagar.com

প্রচেষ্টায় যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বৈঠকে সবগুলোকে আগেরদিন অনুমোদন দেয়া হয়।

এদিকে, ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং-এর বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। বৈঠকের এক পর্যায়ে আমি অংশ নেই। এর আগে যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লী কলকাতাসহ দেশের বাইরে ভেতরে সীমাবদ্ধ আলোচনা হয়েছে। সব কটিতে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। যুদ্ধের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝবার চেষ্টা করি।

১৩ই এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম। মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও আব্দুস সামাদ আজাদ ও কর্নেল ওসমানী কলকাতা আসেন। অন্যরা কলকাতায় রয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছার সীমান্তে আমরা ২টি প্রবেশপথ ঠিক করি। এর একটি হচ্ছে আগরতলা। এই পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন প্রবেশ করবে। অন্যান্য জেলার লোকজনের জন্য প্রবেশপথ করা হয় কলকাতা। পরে অবশ্য সিলেটের জন্য ডাউকি, ময়মনসিংহের জন্য তোরা পাহাড়, রংপুরের জন্য ভুরুঙ্গামারী, দিনাজপুরের জন্য শিলিগুড়ি, বরিশালের জন্য টাকি এরকম বেশ কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথ ঠিক করা হয়।

মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্যে ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্যে আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা প্রথমে চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। পাক দস্যুরা সেখানে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গা রাজধানী করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত তা আর গোপন থাকেনি। চুয়াডাঙ্গার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নতুন স্থানের কথা চিন্তা করতে হলো ।

এই নিয়ে গোলক মজুমদারের সাথে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত হন যে যেখানেই আমরা অনুষ্ঠান করি না কেন, পাক বাহিনীর বিমান হামলার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রিসভার শপথের জন্য নির্বাচিত স্থানের নাম আমি, তাজউদ্দিন ভাই, গোলক মজুমদার এবং বিএসএফ এর চট্টোপাধ্যায় জানতাম। ইতিমধ্যে দ্রুত কতগুলো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নির্ধারণ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার খসড়া রচনা হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বিশ্বের


www.pathagar.com

কাছে নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদনও বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। ইংরেজি কপি বিদেশী সাংবাদিকদের দেয়া হয়।

সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা। আমি আর তাজউদ্দিন ভাই যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরের একটি ছোট্ট স্থানে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে লেখার কাজ করি। আমার কাছে কোন বই নেই–নেই অন্য দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কোন কপি।

আমেরিকার ইন্ডিপেনডেন্স বিল অনেক দিন আগে পড়েছিলাম। সেই অরিজিনাল দলিল চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই বড় বড় হাতের স্বাক্ষরগুলো। কিন্তু ভাষা বা ফর্ম কিছুই মনে নেই। তবে বেশি কিছু ধারণ করার চেষ্টা করলাম না শুধু মনে করলাম, কি কি প্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার রয়েছে। এমনি চিন্তা করে ঘোষণাপত্রের একটা খসড়া তৈরি করলাম। স্বাধীনতার ঘোষণায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হলো। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার পর তাজউদ্দীন ভাইকে দেখলাম। তিনি পছন্দ করলেন। আমি বললাম, আমরা সকলে এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই দলিলের খসড়াটি কোন একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখাতে পারলে ভাল হতো। তিনি বললেন এই মুহূর্তে কাকে আর পাবেন, যদি সম্ভব হয় কাউকে দেখিয়ে নিন।

ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এদের মধ্যে সুব্রত রায় চৌধুরীর নাম আমি শুনেছি। রায় চৌধুরীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। আমি তার লেখা কিছু নিবন্ধ পড়েছি বলে মনে হলো। বিএসএফ-এর মাধ্যমে রায় চৌধুরীর ঠিকানা জেনে নিলাম। টেলিফোনে তার সাথে যোগাযোগ করি। বললাম তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। তিনি রাজি হলেন। বালিগঞ্জে তার বাসা। আমার পরিচয়, রহমত আলী নামে। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে তাকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্রের খসড়া দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। এই খসড়া আমি করেছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দেই। তিনি বলেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলাবার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে আইনানুগ অধিকার, তা মানবাধিকারের একটা অংশ এই কথা স্বাধীনতার সনদে ফুটে উঠেছে। তিনি জানান, তিনি এর ওপর একটা বই লিখবেন। এই ঘোষণাপত্রের একটা কপি তাকে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। এরপর আইন


www.pathagar.com

ব্যবসা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বই লেখা শুরু করেন। তার রচিত বইটির নাম হচ্ছে 'জেনেসিস অব বাংলাদেশ'–আন্তর্জাতিকভাবে অধ্যয়নের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকে বিদ্যালয়ে এখন তা পড়ানো হচ্ছে।

এটা ছিল সুব্রত চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এরপর থেকে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই-এর মত সময়ে অসময়ে সাহায্য সহয়োগিতা করেছেন। আমার জন্য তাঁর দুয়ার সর্বদাই ছিল খোলা।

এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেল প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সামরিক পোশাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোশাক প্রয়োজন। বিএসএফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোশাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের কোন পোশাক পাওয়া গেল না। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তাঁর জন্য পোশাক তৈরি করা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু'জনে কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হই। সমস্ত প্রেসক্লাব লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সার্চ লাইটের মতো অসংখ্য চোখ আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ক্লাবের সেক্রেটারী উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদেরকে প্রথম অনুরোধ জানাই আমাদের উপস্থিতির কথা গোপন রাখতে হবে। এরপর বললাম, আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।

সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে এই প্রেসক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানাই। বললাম, তখন তাদেরকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের একটি বিশেষ বার্তা দেয়া হবে। তাদের কেউ কেউ আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। আমরা কোন উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। এতে তারা কেউ কেউ হতাশও হন। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ি তৈরি থাকবে বলেও জানালাম।

আওয়ামী লীগের এমপি/এমএনএ এবং নেতাদের খবর পাঠিয়ে দেই রাত বারোটার মধ্যে লর্ড সিনহা রোডে সমবেত হওয়ার জন্য। বিএসএফ এর চট্টোপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্যে ১০০টি গাড়ির ব্যবস্থা করতে। এর


www.pathagar.com

৫০টা থাকবে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বহন করার জন্য। অবশিষ্ট ৫০টার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানো হবে।

রাত বারোটা থেকে নেতাদের আমি গাড়িতে তুলে দেই। বলে দেয়া হলো কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। সকাল বেলা আমরা একত্রিত হবো। গাড়ীর চালক নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবেন। সাইক্লোস্টাইল করা স্বাধীনতা সনদেও কপিগুলো গুছিয়ে নিলাম। হাতে লেখা কিছু সংশোধনী রয়েছে। কয়েকজনকে এগুলো সংশোধন করার জন্য দেই। ১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন। সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং ওসমানী একটি গাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

আমি ও আব্দুল মান্নান ভোরের দিকে আগের কর্মসূচি অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। সেই ভোরেও ক্লাবে লোক ধরেনি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক ধরেনি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবেন। আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কেউ জানতে চাইলেন কিভাবে থাকবেন, কোথায় যাবেন। আমি আবারো বলি, আমি আপনাদের সাথে রয়েছি, পথ দেখিয়ে দেব।

আমাদের গাড়িগুলো তখন প্রেসক্লাবের সামনে। উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়িতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০/৬০ টা গাড়িযোগে রওয়ানা হলাম গন্তব্য স্থানের দিকে। আমি ও আবদুল মান্নান দু'জন দুই গাড়িতে। আমার গাড়িতে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাদের সাথে অনেক কথা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থানে আম্রকাননে পৌঁছতে ১১টা বেজে গেল। অনুষ্ঠানের অয়োজন প্রায় শেষ। মাহবুব ও তওফিক ইলাহী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার দেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করবেন। কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট্ট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল


www.pathagar.com

মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করবেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নাম মুজিবনগর নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল প্রথম সরকারের রাজধানী।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তাঁর সাথে আমাদের চিন্তার (বিস্তর) যোগাযোগ রয়েছে। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দি। কিন্তু আমরা তা বলতে চাই না পাক বাহিনী বলুক এটাই আমরা চাচ্ছিলাম। কারণ আমরা যদি বলি বঙ্গবন্ধু পাক শিবিরে, আর তারা যদি অস্বীকার করে তাহলে সমূহ বিপদের আশংকা রয়েছে। আর আমরা যদি বলি তিনি দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন হানাদাররা বলে বসবে তিনি বন্দি আছেন।

আমবাগানের অনুষ্ঠানে ভর দুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি শ্লোগান।

আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে সাংবাদিকদের ফেরত পাঠানো। দুপুরের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। সাংবাদিকদের গাড়ীযোগে ফেরত পাঠানো হল। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফিরেন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই সংবাদ পরিবেশন করেন।

কলকাতার বাসায় ফিরে তাজউদ্দীন ভাইকে জিজ্ঞাসা করি কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের হোসেন আলীকে আমাদের পক্ষে আনা যায় কিনা। ফরিদপুরের আত্মীয় শহিদুল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সাথে যোগাযোগ করা হল। হোসেন আলী প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি হলেন।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : পঞ্চদশ খণ্ড

- লেখক: মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সহযোগী


www.pathagar.com

# পেশার নেশায় কেটে গেছে তেপ্পান্ন বছর

রফিক-উল হক

আগে থেকে ঠিক ছিল না, বড় হয়ে কি হবো। বড় হতে হতে আইনজীবী হয়েছি। কতো বড় আইনজীবী হয়েছি, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তবে, পেশার নেশায় অগুনতি মামলার ভিড়ে কেটে গেছে ৫৩টি বছর। সেসব দিনের কথা লিখতে গেলে বই হয়ে যাবে ৫৩টি। আর এতো সময় পাবো কোথায়? দুই বছর আগে শুভাকাঙ্ক্ষী ও জুনিয়রদের আয়োজনে ঘটা করে 'আমার আইন পেশার ৫০ বছর' উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ঘোষণা দিয়েছিলাম–আর নতুন মামলা নয়। কিন্তু তাতে কী, পেন্ডিং মামলাগুলো নিয়েইতো এখনো পেন্ডুলামের মতো ঘুরছি। তাই, অল্প পরিসরে চেষ্টা করবো আইনজীবী জীবনের অভিজ্ঞতা-অনুভূতির কিছুটা তুলে ধরতে।

কলকাতা থেকে এম.এ. ও এলএলবি পাস করার পর, ১৯৬০ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করি। আমার প্রথম মামলাটিই ছিল ইন্টারেস্টিং। মজা করে নাম দেয়া যায়- 'মামার মামলা'। আমার এক বন্ধুর মামাকে দেশ বিক্রির দায়ে গ্রেফতার করে সরকার। তিনি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এক হাজার টাকার বিনিময়ে কোন এক পাকিস্তানির কাছে মুর্শিদাবাদ বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি। মামলা শুনে আদালত জামিন ও রুল দিলেন। বিচারক বললেন– 'ইফ মুর্শিদাবাদ ক্যান বি সোল্ড বাই ওয়ান থাউজেন্ড টাকা, লেট ইট বি সোল্ড'। আমি বলেছিলাম– ইয়েস, মুর্শিদাবাদ ক্যান নট বি সোল্ড।

ওই বছরই ঢাকায় এসে বিয়ের পিঁড়িতে বসি। বসতে না বসতেই, একই বছর দৌড় দেই লন্ডনে। সেখানের লিন্ কন্‌স্-ইনস্ থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দুই বছর পরে ঢাকায় ফিরে আসি। প্র্যাকটিস শুরু করি ঢাকা হাইকোর্টে। সিনিয়র হিসেবে পাই সে সময়ের বিখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আসরার হোসেনকে।



www.pathagar.com

১৯৬৫ তে যোগ দেই পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে। ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপীলেট ডিভিশনে তালিকাভুক্ত হই।

শুরু থেকেই আমি সারাদিন আদালতে বসে থাকতাম। সিনিয়ররা কিভাবে যুক্তি উপস্থাপন করছেন, তা দেখতাম। প্রথম প্রথম কোন মামলায় ৫০ টাকা পেলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম। তখন এতো মামলা-টাকা-আইনজীবী -বিচারকও ছিল না। এখন শর্টকাট ওয়েতে আইনজীবীরা টাকা কামাতে চান। মামলার পেছনে কঠোর পরিশ্রম করতে চান না। জীবনে সফল হতে হলে হার্ডওয়ার্ক, সিনসিয়ারিটি টু ওয়ার্ক, কমিটমেন্ট টু ক্লায়েন্ট থাকতে হবে। সম্মান করতে হবে আদালতকে। নইলে জীবনে কখনোই সফল হওয়া যাবে না। আইনজীবীর জীবন তো খুব কঠিন। ব্যক্তিগত জীবনে বাধাবিপত্তি তেমন ছিল না, কিন্তু আমাকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। ভোর ছয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত, কখনো কখনো তারও বেশি সময় ধরে কাজ করেছি। অনেক টাকা দামের মামলার চাপে, হাতে জমে থাকা ছোট-খাটো মামলাকে কখনো কম গুরুত্ব দেইনি। সব ধরনের ক্লায়েন্টকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আসছি। সরকারের ব্যাংক সংক্রান্ত আইন থেকে শুরু করে নানা আইনি সহযোগিতা দিয়েছি অকুণ্ঠচিত্তে। কোন সরকারকে আলাদা করে দেখিনি। রাষ্ট্র বা জনগণের কাজ বলে মনে করে আসছি। শুধু দেশেই নয়, বেশ কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্রকেও আইনি সহযোগিতা দেয়ার সুযোগ হয়েছে আমার আইনজীবী জীবনে। যেমন-মালদ্বীপের অনেক আইনই আমার হাতে করা।

বেশ কয়েকবার ফিরিয়ে দিয়েও, ১৯৯০-এ অল্পদিনের জন্য রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আমাকে। মাসিক এক টাকা টোকেন বেতনে সে দায়িত্ব নেই। অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার পরপরই এক সঙ্গে প্রায় দুই হাজার ডিটেনশনকে ছেড়ে দিলাম। আদালতে গিয়ে তালিকা দিতাম। বলতাম, এগুলো ইললিগাল অর্ডার। এগুলো ছেড়ে দিন। তখন ছিলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। তিনি বলতেন, আপনি কি করে দেখলেন? আমি বলতাম, আমি দেখেছি। ১২ ও ১৭ নম্বর বাদে বাকি সবগুলো ছেড়ে দিন। সব ইললিগাল অর্ডার। আমি বিশ্বাস করি, অ্যাটর্নি জেনারেল ইজ নট ফর দ্যা পার্টি। হিজ ডিউটি ইজ টু এক্সপ্লেন দ্য ল' বিফোর দ্য কোর্ট, এন্ড নট টু ডিফেন্ড এনি এভরি অর্ডার পাসড বাই দ্য গভরমেন্ট। বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল ইজ বিহেভিং ফর আওয়ামী লীগ। অ্যাটর্নি জেনারেল নিশ্চয়ই গভরমেন্টের। গভরমেন্ট মানে আওয়ামী লীগ নয়। গভর্মেন্ট ইজ ফর দ্য রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। সবার জন্যেই। সে জন্যেই দুঃখ হয়। বলেও কোন লাভ নেই।


www.pathagar.com

আইন পেশার পাশাপাশি শুরু থেকেই সাধ্যমতো কিছু সমাজসেবা করে আসছি। কিন্তু, তার বিনিময়ে নিজের বা পরিবারের জন্য কখনো কিছু চাইনি। প্রচারের জন্যও কোন বাড়াবাড়ি করিনি। তবে, ওয়ান ইলেভেনের অস্থির সময়টা আমাকে টেনে-হিচঁড়ে প্রচারের পাদপ্রদীপে এনে দাঁড় করিয়েছে। ওই সময়টায় ইমারজেন্সি ছিল। সেটা ইললিগাল। বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় লোক বন্দি। একটার পর একটা ধাক্কা খেতে খেতে প্রায় সব আইনজীবীরা পালিয়ে গেল। কেউ রইলো না মাঠে। সময়ের প্রয়োজনে কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হয়। আইনের শাসন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র চর্চা ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সোচ্চার হয়েছিলাম। দেশের প্রধান দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকে ডিফেন্ড করার মতো কেউ ছিল না। তখন আমি তাদের ডিফেন্ড করলাম। এখন দেখি যারা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলেন, তারা প্রায় সবাই মন্ত্রী-এমপি। আমার অবশ্য এরকম কোন স্বপ্ন ছিল না। অনেকের অনেক রকম ঝামেলা থাকায় হুমকির মুখে পড়ে মুখ লুকিয়েছিল। আমাকে আর্মি বা অন্য কেউ কোন রকম থ্রেট করেনি। আমি ক্লিন ছিলাম, তাই আমার কোন ভয় ছিল না। খুব সম্ভব আইনজীবীদের মধ্যে আমিই সর্বোচ্চ করদাতা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পদও নেই আমার।

সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের আজগুবি শাসন চলছিল দেশে। সরকারের করা বেশির ভাগ মামলা ছিল গোজামিলে ভরা। সংসদ ভবন এলাকায় স্থাপিত আদালতের দেয়া রায়ের কারণে ওগুলো 'ক্যাঙ্গারু কোর্ট' নামে পরিচিতি পায়। পরে, উচ্চ আদালতে বেশির ভাগ মামলাই টেকেনি। খুব আশা ছিল, নির্বাচিত সরকার এলে ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সে আশা এখনও পূরণ হয়নি। তবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আশার পাশাপাশি সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাবো।

• লেখক : সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ও বাংলাদেশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল

অনুলিখন : ইলিয়াস হোসেন, বিশেষ প্রতিনিধি, ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন


www.pathagar.com

# আইন পেশায় শর্টকাট কোনো পথ নেই

## মাহবুবে আলম

১৯৭৩ সালের জানুয়ারির দিকে নিয়ম ছিল, এনরোলমেন্টের দুই বছর ট্রায়াল কোর্টে থাকতে হতো। তারপর হাইকোর্টের সনদ পাওয়া যেত। সে সময় আইনজীবীর সংখ্যা সীমিত ছিল। হাজার খানেক আইনজীবীও ছিল কি-না সন্দেহ।

আজকে যে রকম হাইকোর্টে বা জেলা জজ আদালতে অনেক মহিলা আইনজীবীকে দেখি, যা মোট আইনজীবীর এক-চতুর্থাংশ। সে সময় জজ কোর্টে গুলফা শাহানা বানু নামে একজন মহিলা আইনজীবী, যিনি নিয়মিত আদালতে আসতেন। আর সবাই পুরুষ আইনজীবী। তখন ফৌজদারি মামলা এতো ছিল না। নিম্ন আদালতের তখনকার বিচারকরা অনেক নামকরা জাঁদরেল বিচারক ছিলেন। ঢাকার জেলা জজ হিসেবে হান্নান চৌধুরী তৎকালীন গভর্নরকে সাজা দিয়েছিলেন দালাল আইনে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তখন বিশেষ আইনে মামলার জট ছিল, সেটা হল : কোলাবোরেটর-দালাল আইনের বিচার। সে সময়কার প্রসিকিউটররা আরো বেশি সচেতন হলে আরো বেশি দালালের বিচার করা যেত। সে সময় অধিক সংখ্যক দালালদের বিচার করা যায়নি, যার কারণ প্রসিকিউটরদের গাফিলতি। এই দালালদের বিচার হলে পরবর্তী সময়ে তারা আর রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হতে পারত না, আজ তারা যে স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে তা আর করতে পারত না।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে যখন আমি হাইকোর্টে সনদ পেলাম তখন আইনজীবীর সংখ্যা খুব বেশি না। একজন মহিলা আইনজীবী ছিলেন কামরুন্নাহার লাইলী। আরো দুই একজন হয়ত ছিলেন; কিন্তু তারা রীতিমত আদালতে আসতেন না। আমরা যখন আইন পেশায় যোগদান করি তখন নিয়ম ছিল সিনিয়রদের সঙ্গে থাকা। পেশাগত জীবনে অনেক দিন বেশ কয়েকজন নামকরা আইনজীবীর অধীনে জুনিয়র ছিলাম। ফলে তারাও



www.pathagar.com

আমাদের অনেক কাজ করাতেন ও শিখাতেন। আমার সিনিয়র রংপুরের ফজলুল করিম বললেন, একটা মামলার শুনানি হবে, কোর্টে গিয়ে মামলার নথিগুলো দেখে আসো। আমি সারাদিন ধরে দেখলাম। সাক্ষী, আরজি, এক্সিবিট দেখে ওনাকে নোট রেডি করে দিলাম। শর্টকাট কোনো পথ আমি নেইনি। এই পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে শর্টকাট পথ নেই।

তারপর ধীরে ধীরে বার রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলাম। ১৯৭৭-৭৮ সালে বারের সহকারী সম্পাদক হলাম। যখন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করলেন তখন তিনি কোর্টে আসতেন। আইনজীবীদের সাথে আলোচনা করতেন। তরুণ আইনজীবী হিসেবে আমিও থাকতাম। ১৯৯২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যখন গণআদালত গঠন করা হল তখন আমরাও ছিলাম সেখানে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সেদিন সকাল থেকে সব গেট বন্ধ করে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী মোতায়েন করে। তবে, বেলা ১২টার দিকে চারদিক থেকে জনতার স্রোত এসে বন্ধ গেটগুলো ভেঙে উদ্যানে প্রবেশ করে। লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল দেখে পুলিশ বিডিআর ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলার মধ্যে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার কাজ চলে।

জাহানারা ইমাম, নীলিমা ইব্রাহিমসহ গণআদালতের ২৪ জন সংগঠকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছিল। সেসব মামলায় আমরা সিনিয়রদের সঙ্গে থেকে সবার মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছি। ১৯৯৩-৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হই। ভাষা আন্দোলনের শহীদ শফিউর রহমান আমাদের কোর্টের কর্মচারী ছিলেন। আমি পদক্ষেপ নিলাম আমাদের আইনজীবী সমিতির দু'জন শহীদ সদস্যের নামে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করার। গেট দিয়ে ঢোকার সময় দেখবেন, ছোট শ্বেত পাথরে শহীদ আব্দুল আহাদ এবং একেএম সিদ্দিক ওরফে হেনা মিয়ার নামে স্মৃতিফলক স্থাপন করা রয়েছে। লেখার ভাষাটা ঠিক করার জন্য আনিসুজ্জামান স্যারকে দেখানো হয়। তখন স্মৃতিফলক ছাড়া আর কিছু করা হয়নি। ওইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির তালিকা অনুযায়ী নামের তালিকায় শুধু অ্যাডভোকেট যুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্টেও আইনজীবীদের সাথে শুধু নাম উল্লেখ থাকে। তার পদবী বা ডিগ্রী উল্লেখ থাকে না। এতে বৈষম্য হয়। সেটা এখনো বহাল আছে। ১৯৯৮ সালের ১৫ নভেম্বর সরকার আমাকে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল


www.pathagar.com

হিসেবে নিয়োগ দেয়। এরপর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তৃতীয় বিচারকের আদালতে শুনানিতে আমি অংশ নিই।

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিততে পারেনি। অনানুষ্ঠানিক ফল দেখেই আমি ৩ অক্টোবর পদত্যাগ করি। আবারো প্রাকটিসে চলে আসলাম। ২০০৫-০৬ বর্ষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হই।

নির্বাচিত হয়ে আমার স্বপ্ন ছিল, দু'জন শহীদের ব্যাপারে আরো কিছু করা যায় কিনা। সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলাম। এরপর আমি উত্তরের হলটি শহীদ একেএম সিদ্দিকের নামে নামকরণ করলাম এবং দক্ষিণের হলটি শহীদ আব্দুল আহাদের নামে নামকরণ করলাম। ভাষা আন্দোলনে নিহত হওয়া শহীদ শফিউর রহমানের নামে মিলনায়তনটির নামকরণ করলাম।

আমার তৃপ্তি হচ্ছে, দু'জন শহীদ আইনজীবীর নাম স্থায়ী করার জন্য দুটো হলের নাম দিয়েছিলাম। তবে দক্ষিণের হলটির নাম কমিটি পরে সংশোধন করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আইনজীবীদের প্রাণপুরুষ শামসুল হক চৌধুরীর নামে করে। তবে, এনেক্স ভবনের হলের নাম শহীদ আহাদ হল নামকরণ করেছে কমিটি। আমি সভাপতির পদ থেকে চলে যাওয়ার পরে ৫ লাখ টাকা অনুদান দিয়ে আইনজীবীদের কল্যাণের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করি। সেটা এখনো আছে। সেখান থেকে পাওয়া লাভ থেকে প্রতি বছর একজন দুস্থ আইনজীবীকে সাহায্য দেয়া হয়।

এরপর ১/১১ চলে আসল। এ সময় রাজনৈতিক ভাবে যারা নিষ্পেষিত হয়েছিলেন তার মধ্যে সেসময়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলায় আমি বেশ কয়েকবার উপস্থিত হয়েছিলাম এবং আমার সাধ্য মতো কাজ করার চেষ্টা করেছি।

মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ থেকে শুনানি করার আমার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী, ফতোয়া মামলা, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, জেল হত্যা মামলা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির মামলা রয়েছে।

আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া বেশ কিছু অর্থ ফেরত আনতে পেরেছি। আইনজীবী হিসেবে আমার একটাই বিবেচ্য বিষয়


www.pathagar.com

হবে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন মামলা আমি করব না। এই মনোভাবটা যেন আমি চিরকাল রাখতে পারি।

নারী উন্নয়নের জন্য বা দুস্থ মানুষের উন্নয়নের জন্য মামলাগুলো সবসময় করতে সচেষ্ট থাকব। তাতে আমার আর্থিক ক্ষতি হোক আপত্তি নেই।

প্রথমদিকে দেখেছি, বয়স্করা সময় কাটানোর জন্য এ পেশায় আসেন। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেই তারা আসছেন। এদের ভিতরে কাজ শেখার স্পিরিট বেশি। আদালতে মামলা পরিচালনার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা কোনো অংশেই আমি কম দেখিনি। অনেক মামলায় আমার বিরুদ্ধেও জুনিয়র মেয়েরা মামলা পরিচালনা করেছে। তাদের পারফরমেন্স অনেক ভালো।

প্রথম নারী বিচারপতি হিসেবে ২০০০ সালের ২৮ মে শপথ নেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা। প্রথম বঙ্গভবনে যাওয়ার পর যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। তখন প্রধানমন্ত্রী যে আবেগ নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তা এখনো আমি ভুলতে পারি না। বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা আপিল বিভাগে প্রথম নারী বিচারপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এখন নারী বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে ছয় জনে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রত্যেকেই তাদের সাধ্যমত কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। এই কারণে যে, আদালতে বিচারের সময় পুরোপুরিভাবে তারা ব্যবহার করেন। সময় মতো তারা আদালতে বসেন। মামলার কাজ ছাড়া তারা অন্য কোনো কাজে সময় ক্ষেপণ করেন না। আইনজীবীরাও তাদের সহযোগিতা করেন।

আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার পর নারী আইন কর্মকর্তার সংখ্যা বেড়েছে। তাদের বেশির ভাগই সৎ, দক্ষ আর নিষ্ঠাবান। আমি সম্পূর্ণভাবে তাদের সহযোগিতা পাচ্ছি। বিশেষ করে কাস্টমস, ভ্যাট বিষয়গুলো তারা যেভাবে রপ্ত করেছেন, আদালতও তাদের যেভাবে প্রশংসা করে তাতে আমার গর্ব হয়।

- লেখক : বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি

অনুলিখন: শামীমা আক্তার, বিশেষ প্রতিনিধি, আরটিভি


www.pathagar.com

# A Genesis of Amendments to Constitution in Bangladesh

Rokanuddin Mahmud

In a span of last forty years, the Constitution of Bangladesh has been amended fifteen times by the Parliament since its promulgation on 4th November 1972, having been enacted by the Constituent Assembly. The importance and consequences of these amendments were of varying degrees. Some of the amendments had a far reaching consequence in the national life of Bangladesh compared to others.

There were two sets of amendments, one were true constitutional amendments introduced in the Parliament as the Constitution Amendment Acts under Article 142 of the Constitution and passed by not less than 2/3rd majority in the Parliament. The other set of amendments were in the nature of granting retrospective validation and ratification to various actions and orders of extra constitutional regimes such as the 5th and 7th Amendments.

The 11th and 12th Amendments were the only amendments which were passed by the votes of both the major political parties, i.e. BNP and Awami League.

An analytical study of the amendments to the Constitution reveals that most of the amendments



www.pathagar.com

to the Constitution were made to suit the political expediency and convenience of the ruling party rather than a desire to further and advance the cause of rule of law, practice of democracy and constitutional governance in Bangladesh.

**1st Amendment**

The 1st Amendment to the Constitution was made on 15th July 1973, not long after its promulgation, to provide that any law for detention, prosecution or punishment of war criminals will not be void or unlawful on the ground that such law is inconsistent with the provisions of the Constitution.

The amendment further inserted Article 47A in the Constitution with two clauses, one providing that the fundamental rights guaranteed by Article 31 (equal protection of law), Article 35(1) and (3) (certain protections in respect of trial and punishment) and Article 44 (the right to enforcement of fundamental rights) would not be available to persons detained, prosecuted or punished for war crimes. The other clause prohibits such persons from moving the Supreme Court of Bangladesh for any constitutional remedy (Article 102 of the Constitution). Immediately after the amendment, the International War Crimes (Tribunals) Act, 1973 was enacted for trial and punishment of persons who had committed atrocities in the territories of Bangladesh.

The present trial and punishment of several persons on charges of committing crimes against humanity during the War of Liberation in 1971 is under the 1973 Act. The accuseds are unable to question the constitutionality of the 1973 Act or to enforce the fundamental rights which have been


www.pathagar.com

withheld or avail any of the constitutional remedies by reason of the 1st Amendment.

**2nd Amendment**

The original Constitution contained no provision for proclamation of emergency and suspension of fundamental rights during emergency. Besides, preventive detention of a person was also not permitted.

The 2nd Amendment enacted on 22nd September 1973 made it possible to make laws for preventive detention. It also inserted Part XIA in the Constitution embodying provisions for proclamation of emergency, and for making laws or passing orders in disregard of certain fundamental rights of citizens and suspending the right to move any Court for enforcement of any of the fundamental rights during emergency.

The 2nd Amendment has had a far reaching impact.

Soon after the amendment, the Special Powers Act, 1974 was enacted providing for preventive detention of persons by executive order. This power has been frequently used by successive Governments, subjecting citizens to detention without trial.

Several States of Emergency have been proclaimed in the past forty two years, the first coming in December, 1974 following the famine of 1974, the second following the assassination of President Ziaur Rahman on 30th May 1981, the third in November 1987 following the dissolution of the 3rd Parliament and the fourth in January 2007 during the Care-taker Government headed by President Iajuddin. Of


www.pathagar.com

these States of Emergency, the latest episode was for almost two years.

During the States of Emergency, many were subjected to long periods of detention without trial, and the citizens remained deprived of their fundamental rights without any constitutional recourse, besides being subjected to draconian laws, rules, orders and measures without legal remedy. There were allegations of torture, inhumane and degrading treatment during the last Emergency in addition to collection of forced contributions to the National Exchequer from business leaders.

**3rd Amendment**

The 3rd Amendment enacted on 28th November 1974 was in order to give effect to the Agreement between the Governments of the People's Republic of Bangladesh and Republic of India entered into on 16th May 1974, by which the articles of the Constitution dealing with the territory of Bangladesh was amended so as to give up Bangladesh's claim in respect of Berubari while retaining Dahagram and Angarpota, all of which are enclaves along the border between the two countries.

**4th Amendment**

The 4th Amendment, having a very far reaching consequence, was enacted on 25th January 1975 making wholesale changes to the Constitution, which drastically transformed the nature and character of the Republic.

This amendment created a one-party State by inserting Part VI A to the Constitution. The Parliamentary form of Government ceased to exist, and instead Presidential form introduced, but


www.pathagar.com

without its check and balance. The Supreme Court's power to enforce fundamental rights was taken away. Supreme Court judges became removable by the President on ground of misbehavior/incapacity. The President could appoint judges of the Supreme Court without consultation with the Chief Justice. The Supreme Court ceased to have control of the subordinate judiciary, which now vested in the President. The President became the all powerful authority in the Republic.

The Republic as envisaged under the 4th Amendment of the Constitution actually lasted for a brief period of time until the Constitution was made subordinate to the Proclamation dated 20th August in 1975 following the gruesome assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his entire family on 15th August 1975. Thereafter, Part VI A was omitted by the Proclamation dated 08th November 1975 issued by Chief Justice, Mr. Justice A. S. M. Sayem, who assumed power as President and Chief Martial Law Administrator. However, the 4th Amendment has had an enduring impact which reverberates till today, continuing to feature in our political discourse.

**5th Amendment**

The country was under martial law after the assassination of Bangabandhu. During the martial law period, several constitutional changes were made by issuing Martial Law Proclamation orders. Those constitutional changes were not made by the Parliament, which was not in existence then, and, in themselves, lacked legitimacy.


www.pathagar.com

Following the election of a new Parliament in February 1979, it was considered necessary at the time to accord constitutional validity to the actions taken since 15th August 1975. Accordingly, the Parliament passed the Constitution (Fifth Amendment) Act 1979 on 6th April 1979 to ratify and confirm such actions retrospectively, and inserted the ratification clause in the Fourth Schedule, so as to make it a part of those transitional and temporary provisions that existed from 26th March 1971 till promulgation of the Constitution as protected by Article 150 of the Constitution.

The nature of this amendment was in marked contrast to the earlier amendments, which were passed by the Parliament in exercise of its powers under the Constitution prospectively.

The 5th Amendment was declared unconstitutional by the Supreme Court in a recent judgment.

**6th Amendment**

The 6th Amendment was more a matter of convenience than substance. Vice President Justice Abdus Sattar, who was then the Acting President, wanted to contest the election in November 1981 for the office of President, which fell vacant after the assassination of President Ziaur Rahman on 30 May 1981, but there was a doubt as to whether he could contest the election without resigning from the post of Vice President. Hence, the 6th Amendment was enacted on 10th July 1981 providing that if a Vice President was elected as President, he would be deemed as having vacated his office of Vice President on the date on which he


www.pathagar.com

enters upon the office of the President.

**7th Amendment**

The country was put under Martial Law on 24th March 1982 by the then Chief of Army Staff, Lt. Gen. Hussain Muhammad Ershad, who by proclamation assumed all powers of the Republic as Chief Martial Law Administrator and suspended the Constitution with immediate effect.

During this period, when the country was ruled by Martial Law Proclamation and orders passed thereunder, the sitting Chief Justice was made to retire suddenly by reason of a proviso inserted to the Martial Law Proclamation by Proclamation (1st Amendment) Order, 1982 despite him not having attained the retiring age.

The aforesaid proviso was added in such an abrupt manner that the then Chief Justice, Mr. Justice Kamaluddin Hussain, was neither aware nor notified of it, and as a consequence, he came to know of it when a lawyer drew his attention to a newspaper report during the course of a hearing of a cause by the Appellate Division presided over by him on the day following the order

In May 1982, the Proclamation (2nd Amendment) Order, 1982 was promulgated authorizing the Chief Martial Law Administrator to establish permanent Benches of High Court Division of the Supreme Court in outlying districts, following which the High Court Division was fragmented into several permanent Benches located in 6 outlying districts in addition to Dhaka.

The election to the 3rd Parliament was held in May, 1986. Martial law was withdrawn on 11th


www.pathagar.com

November 1986. The 3rd Parliament enacted the Constitution (7th Amendment) Act, 1986 following the pattern of Constitution (5th Amendment) Act, 1979 validating all laws, rules, orders, actions, etc. that was passed or taken between 24th March 1982 and 11th November 1986 by inserting its provision in the Fourth Schedule of the Constitution.

Additionally, the 7th Amendment raised the retirement age of Supreme Court judges from 62 to 65.

Save and except the part relating to the retiring age of judges, the 7th Amendment has recently been declared unconstitutional by the Supreme Court.

**8th Amendment**

The lawyers started a movement in 1982 against fragmentation of the Supreme Court by Martial Law Proclamation into a several permanent benches. When the 7th Amendment was passed in the Parliament, the fragmentation gained constitutional foothold. But the agitation continued terming the fragmented permanent Benches as unconstitutional.

Notwithstanding such agitation, the Constitution (8th Amendment) Act, 1988 was passed making Dhaka the permanent seat of the Supreme Court, setting up 6 permanent Benches outside the capital and authorizing the President to determine the territorial jurisdiction of the permanent benches outside the capital.

By the 8th Amendment, Islam was made the State religion.

The lawyers challenged the legality of the 8th


www.pathagar.com

Amendment insofar as it purported to validate fragmentation of the Supreme Court. The Supreme Court declared such amendment unconstitutional and restored the original provision of the Constitution, whereupon the fragmented bits and pieces of the Supreme Court returned to Dhaka. The part of the 8th Amendment relating to State of Religion was, however, not the subject matter of challenge.

The lawyers movement against the Ershad Regime started soon after the Proclamation (2nd Amendment) Order, 1982 was issued in May, 1982 and it continued throughout the entire Ershad Regime. It was so intense that for a period of about two years, the lawyers in Dhaka boycotted the Supreme Court, which could not function normally. The matter was further aggravated when the lawyers boycotted Chief Justice M. A. Munim presiding the Appellate Division as he allowed deployment of police in the Supreme Court premises. The Appellate Division could only function after a lapse of several months when Mr. Justice Munim agreed to discontinue presiding the Appellate Division.

It is ironical that a lawyers community, which in a single voice, protested and boycotted a Chief Justice for his mere deployment of police personnel in the precinct, taking serious exception to the presence of police in the precinct, now finds amongst itself existence of certain members who take pride in getting escorted by police in verendah of the Court. Alas, what the lawyer's did not accept even during the Martial Law regime, is now seen as symbol of prestige and standing.


www.pathagar.com

The lawyers movement was so unified that during the entire period of Ershad regime, there was but only one President of the Supreme Court Bar Association, namely Late Shamsul Huq Chowdhury, who was usually elected uncontested. When one of his lackeys shamelessly broke the rank, reportedly on the instigation of the Military leaders and being gained over, contested an election against Late Chowdhury, he ignominiously lost the election, securing for himself a pitiful haul of only 23 votes. What began as a movement of the lawyers, finally graduated into a people's movement leading to the fall of Ershad Regime from grace.

**9th Amendment**

The 9th Amendment made on 11th July 1989 created a post of Vice President (which was not in the Constitution at the time) to be elected simultaneously with the President. The amendment was inconsequential and very short-lived. No election was ever held pursuant to it. The regime that introduced it fell in the public uprising of 1990, paving the way for ultimate restoration of the Parliamentary form of Government in 1991, which resulted in omission of the post of Vice President.

**10th Amendment**

The 10th Amendment enacted on 23rd June 1990 increased the number of seats reserved for women from 15 to 30, and the period for such reservation was extended for another 10 years from the first meeting of the next Parliament.

**11th Amendment**

In the face of the public uprising of 1990 and demands for an election under a neutral


www.pathagar.com

government, the resignation of President Ershad was announced on 4th December 1990.

The opposition political parties reached a consensus for appointment of Mr. Justice Shahabuddin Ahmed, the then Chief Justice, as the Head of the Government, but he was unwilling as he had a long tenure left in his office. He was finally persuaded to agree to become the Acting President only on condition that after the elections were held, and a new government formed, he would be allowed to return to the office of Chief Justice to complete his tenure. Accordingly, he was first appointed as Vice President upon resignation of the incumbent Vice President, paving the way for him to become the Acting President heading a consensus interim Government on resignation of General Ershad from the post of President on 6th December 1990.

The General Elections were held in February, 1991 under the interim Government of Mr. Justice Shahbuddin Ahmed. The Constitution (11th Amendment) Act, 1991 was passed on 10th August 1991 by the newly elected Parliament, which ratified all actions taken by the interim Government of Mr. Justice Shahabuddin Ahmed, including his appointment as Vice President, his assumption of office of acting President, election of a President by the new Parliament and allowing for his return to the office of Chief Justice when a newly elected President entered office.

**12th Amendment**

The Constitution (12th Amendment) Act, 1991 was enacted on 18th September 1991 restoring the Parliamentary form of Government substantially as provided in the original Constitution, pursuant to which, a new President was elected.


www.pathagar.com

The election of the new President allowed Mr. Justice Shahabuddin to return to and resume the office of Chief Justice pursuant to the earlier 11th Amendment.

The significance of this amendment was that while following the elections of February, 1991, the Prime Minister initially took office as a Prime Minister under a Presidential form of Government, following the 12th Amendment, she became the Prime Minister in a true Parliamentary form of Government.

The Parliamentary form of Government, which was abolished by the 4th Amendment, was thus finally restored by the 12th Amendment.

**13th Amendment**

The original Constitution provided for the Prime Minister and other Ministers to hold office after the dissolution of Parliament and until the General Election was held and a newly elected Government entered office.

Following the allegations of massive rigging and fraud in Magura bye-election, members of the opposition parties (Awami League, Jatiya Party, Jamaat Islami, NDP and Workers Party) in the 5th Parliament resigned en masse on 28th December 1994 for the failure of the ruling party BNP to introduce a Bill in the Parliament for amending the Constitution making provisions for holding General Elections under neutral, non-partisan caretaker government.

The Speaker informed the House that in his view, en masse resignation on such ground was not contemplated by Article 67(2) of the Constitution.


www.pathagar.com

Following the Speaker's observation, two writ petitions were filed in the High Court Division, one challenging the validity of resignation of 147 members and the other seeking a mandamus on the Speaker for a decision on the validity of those resignations. Both the writ petitions were dismissed as being premature on the ground that the Speaker had yet not taken any decision.

The opposition party members continued their boycott and a question then arose whether their boycott amount to being "absent" from the Parliament, and what should be the basis of computing 90 consecutive sitting days under Article 67(1)(b) for the purposes of determining the vacation of their seats in Parliament.

The President, in exercise of his power under Article 106 of the Constitution, referred the matter to the Supreme Court for an advisory opinion on the matter. The reference raised the question whether walk out from the Parliament followed by a boycott by the opposition members would constitute absence without leave of Parliament. The Supreme Court opined that the word "absent" could not receive different interpretation in different circumstances, and walkout and boycott, by whatever name it was called, means "not present", and hence they would constitute "absence", which when continued for 90 consecutive sitting days, would result in vacation of seats of the members concerned. The Supreme Court also held that in computing 90 consecutive days, the period between two sessions and also adjournments in a particular session should be excluded.

The opposition members consequently lost their


www.pathagar.com

membership. Faced with the prospect of holding bye-elections in 147 seats towards the end of the tenure of the Parliament, the Government preferred to dissolve the Parliament on 24th November 1995 and hold the General Elections on 15th February 1996, which was boycotted by the opposition political parties.

This intensified the opposition movement for establishment of a non party caretaker government to hold General Elections. They refused to accept the result of the one-sided elections and brought the country to a total and complete halt through a program of indefinite strike, non-cooperation and mass abstention from work by public servants, which ultimately lasted more than a month and brought the Government to its knees.

The Parliament, which was elected in the one-sided General Election boycotted by all opposition political parties, had no alternative but to accede to the public demand and enact the Constitution (13th Amendment) Act, 1996 on 26th March 1996 making provision for a Non-Party Care-Taker Government headed by a Chief Advisor and not more than ten Advisors to be in office from dissolution of Parliament till a new Government entering office after a general election.

Under the 13th Amendment, the last retired Chief Justice of Bangladesh would be appointed Chief Advisor by the President, and in case of his unavailability or unwillingness, the retired Chief Justice who had retired next before him would be so appointed.

If no such retired Chief Justice was available, then a person from among the retired Judges of the


www.pathagar.com

Appellate Division who retired last, and if he was not available or unwilling, the Judge who retired next before him would be appointed as the Chief Advisor.

In the event no such Judge was available or willing, the President was required to appoint from amongst the citizens of Bangladesh a person who was qualified to be appointed as the Chief Advisor after consultation with the major political parties.

Finally, if these provisions could not be given effect to, the President would assume the functions of the Chief Advisor in addition to his functions under the Constitution.

Following the 13th Amendment, Parliament was dissolved on 30th March 1996 and the then last retired Chief Justice was appointed as the Chief Advisor to form and head the Non-Party Care-taker Government. Accordingly, the General Election was held in June, 1996 with the participation of all political parties, and a new Government, termed as consensus Government, was formed by Awami League with the support of Jatiya Party and JSD (Rab).

It may be noted here that in May 1996, when the first Non-Party Care-taker Government of Mr. Justice Md. Habibur Rahman was in office, the then Chief of Staff of the Army, Lt. Gen. A. S. M. Nasim, embarked upon a misadventure to overthrow the legitimate Government of the day by an abortive coup attempt, which was nipped in the bud by the Government with the help of saner elements within the armed forces.

All general elections held since the 13th Amendment, namely June 1996, October 2001 and December 2008, under Care-Taker Governments


www.pathagar.com

saw the party which had been in power immediately before the dissolution of Parliament defeated, and the party which had been in opposition win. All these general elections were widely considered to be free and fair like the General Elections of 1991, also under the consensus interim Government of Mr. Justice Shahabuddin Ahmed (ratified by the 11th Amendment). On the other hand, in all the elections held with a political government in power, the incumbent party in power invariably won the election, namely, the General Elections of 1973, 1979, 1986, 1988 and February, 1996. This stark fact was noted in the minority judgement of the famous 13th Amendment Judgement by Mr. M. A. Wahhab Miah.

There was, however, a darker side to the 13th Amendment, inasmuch that it politicized the appointment to the post of Chief Justice as well as the order of elevations to the Appellate Division. The political parties in power started making appointments to the Appellate Division not on the basis of seniority anymore, but rather upon the political consideration of positioning such elevated persons in line for appointment as the Chief Advisor when the next dissolution of the Parliament occurred upon expiry of its tenure.

In January, 2001, when two vacancies arose in the Appellate Division, the then Government, instead of appointing the two senior most judges of the High Court Division, chose the next two senior judges in order to avoid the prospect of Mr. Justice K. M. Hasan ever becoming the last retired Chief Justice to be qualified for appointment as the Chief Advisor.


www.pathagar.com

The supersession of Mr. Justice K. M. Hasan was challenged in a writ petition. The judgment in the writ petition was delivered by Mr. Justice Syed Amirul Islam who presided the Bench, and he held that appointment in the Appellate Division was not a promotion on seniority but a fresh appointment for which seniority is not a determining criteria. As fate would have it, when Mr. Justice K. M. Hasan became the Chief Justice and Mr. Justice Syed Amirul Islam was due for elevation to the Appellate Division as the senior most judge of the High Court Division, he was not considered upon a citation of the reasoning given in his own judgement.

As it so happened, in the General Elections held in October 2001, the then opposition political party got elected to power, and the incoming Government, when the next opportunity arose, lost no time in elevating those two superseded judges of the High Court Division to the Appellate Division. Over and above, when the appropriate opportunity arose, the Government promptly appointed, in May 2003, the senior of the two elevated judges, Mr. Justice K. M. Hasan, as the Chief Justice, this time in supersession of two judges who were senior to him in terms of appointment in the Appellate Division, on a proclaimed reasoning that it was so done to remedy a wrong.

The 13th Amendment has been declared unconstitutional recently by the Supreme Court (in 2011) by a majority decision of the Appellate Division holding that it offended against the basic structure of the constitution having provided for an unelected Government in the interregnum between two Parliaments and also encroached upon the independence of judiciary. Peculiarly enough, in the


www.pathagar.com

very next breath, the Supreme Court in its short order, recommended for holding next two General Elections under the Care-taker Government which had been declared by it unconstitutional. The question is, how could a Supreme Court recommend holding of next two general elections under a provision which it has declared unconstitutional?

**14th Amendment**

Before the 13th Amendment was declared unconstitutional, the country witnessed a further politicization of the post of Chief Justice, when the Government had passed the 14th Amendment of the Constitution on 17th May 2004 to raise the retiring age of the judges of the Supreme Court from 65 to 67 for the ostensible reason to ensure that Mr. Justice K.M. Hasan remained the last retired Chief Justice, when the existing Parliament was due for dissolution on expiry of its tenure in October, 2006.

This part of the 14th Amendment generated a political controversy as the Mr. Justice K. M. Hasan was allegedly at one time not only a member of BNP, but also held an office in BNP, besides holding a diplomatic assignment as the Ambassador to Iraq during the regime of General Zia.

The political controversy so generated intensified from the middle of 2006, and reached a crescendo as dissolution of the Parliament became imminent, and the prospect of his appointment as the Chief Advisor neared. In the face of massive political agitation directed against him, the country came to a standstill, and under the prevailing circumstances Mr. Justice K. M. Hasan had no alternative but to


www.pathagar.com

express his unwillingness to become the Chief Advisor. However, the political controversy was not to rest there, as President Iajuddin, instead of trying other options prescribed by the 13th Amendment, himself assumed the office of Chief Advisor, and the die was thus cast for the State of Emergency of 2007, which commonly came to be known as 1/11.

## 15th Amendment

The Constitution (15th Amendment) Act, 2011 was enacted on 03rd July 2011 making extensive amendments to the Constitution before the judges of the Appellate Division could muster sufficient time to write the full text of the 13th Amendment Judgment. The amendments so passed in fact made the 13th Amendment judgment redundant. It may be noted here that the full text of the judgment was made available to the public on 16th September 2012 about 16 months after the pronouncement of the short order.

The main features of the 15 Amendment are as follows:

(i) Though Islam has been retained as the State religion, but it has been made obligatory for the State to ensure equal status and equal right in the practice of other religions.

(ii) It has been provided that the Portrait of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, should be displayed in the offices of the President, Prime Minister, the Speaker and the Chief Justice and all Government and Semi Government Offices and educational institutions.


www.pathagar.com

(iii) Nationalism, socialism, democracy and secularism have been restored as fundamental principles of State policy.

(iv) A new Article 7A has been inserted making it an offence of sedition, punishable with highest punishment prescribed for other offences as prescribed by law, to abrogate, repeal, suspend or subvert the Constitution by show or use of force or any other unconstitutional means or to attempt or conspire to do any such thing.

(v) A new Article 7B has been inserted prohibiting amendment of certain provisions of the Constitution, including Articles relating to basic structure of the Constitution.

(vi) Abolition of the provisions relating to Non-Party Care-Taker Government.

(vii) The number of seats reserved for women was increased to 50.

(viii) The Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman given on 7th March 1971, the telegram of declaration of independence of Bangladesh made by him on 26th March 1971 and the proclamation of independence of the Mujib Nagar Government on 10th April 1971 have been expressly mentioned as a transitional and temporary provision and set out fully in the 6th and 7th Schedules of the Constitution.

The 15th Amendment has generated a new political controversy as some of the political parties are agitating for restoration of the Care-Taker Government provision in the interest of free and fair election. Their political agitation derives


www.pathagar.com

strength from the judgment of the Supreme Court which declared the 13th Amendment incorporating the provision for Care-Taker Government unconstitutional, but at the same time observed that the next two General Elections could be held under a Care-taker Government for the sake of free and fair elections.

**Conclusions:**

A deeper reflection makes it clear that it is difficult to fully appreciate the amendments of the Constitution of Bangladesh divorced from its political development, with all its aberrations, contradictions and paradoxes.

Bengalis, who imbibed by the highest ideals of democracy and fundamental human rights, fought the War of Liberation to establish Bangladesh as an independent, sovereign State, has seen its first democratically elected Parliament pass a constitutional amendment to convert a parliamentary form of Government into a one party State with an authoritarian form of Government giving the President absolute power and authority.

We saw a constitutional amendment purporting to ratify the usurpation of the office of President through a Proclamation of Martial Law made by an elected member of Parliament, who, only days earlier, was a Minister in the Cabinet of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The same constitutional amendment ratified the extraordinary episode of the first Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Sayem, becoming the first Chief Martial Law Administrator of the country. One wonders if in the history of nations, can another such instance be found! Bengalis silently witnessed the same


www.pathagar.com

constitutional amendment ratify the arrival of General Zia to head the Republic unelected by removing Mr. Justice Sayem from the post of President and Chief Martial Law Administrator and his restoration of multi party democracy and ending of martial law.

We also saw the widow of General Zia, Begum Khaleda Zia, becoming the Prime Minister and amending the Constitution by the 12th Amendment to restore the parliamentary form of Government after an interval of 16 years.

The Nation saw Sheikh Hasina, the daughter of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, lead her party and the people in their struggle to ensure free and fair elections under a Care-Taker Government, which was achieved by compelling the Government in power to enact the 13th Amendment.

The Nation has then seen that same leader and party author the 15th Amendment to abolish the self same provision of Care-Taker Government, only for the other leader, who once described neutrality as the preserve of idiots and infants, take to the streets with her party crying for restoration of a neutral Care-taker Government provision in the Constitution to conduct free and fair elections!

- Writer: Former President, Supreme Court Bar Association and Former Vice Chairman, Bangladesh Bar Council


www.pathagar.com

# সংবিধান যেভাবে বাংলায় হলো

আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হলো, তখন আমাদের একটা আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো নিজেদের সংবিধান রচনা। সংবিধান কথাটা তখনো চালু হয়নি, প্রচলিত শব্দ ছিল শাসনতন্ত্র। সেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পাকিস্তানের লেগেছিল ন বছর। আমাদের লক্ষ্য হলো ন মাসে তা লিখে ফেলা। অবশ্য অমন নির্দিষ্ট করে সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে যাঁরা পাকিস্তান গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে ১৯৭২ সালে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ গণপরিষদ। এপ্রিল মাসে সেই গণপরিষদ সংবিধান-প্রণয়নের জন্যে একটি কমিটি করে দেন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে। আশা প্রকাশ করা হয়, যত শীঘ্র সম্ভব সংবিধান প্রণীত হবে।

আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আহসান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর জায়গায় আমি সদ্য বিভাগীয় অধ্যক্ষতার দায়িত্ব নিয়েছি। সংবিধান-প্রণয়নের দায়িত্ব নিয়ে কামাল হোসেন এত্তেলা পাঠালেন, বাংলায় সংবিধান রচিত হবে, ইংরেজি খসড়ার বাংলা তৈরি করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। সংবিধান তো বাংলায়ই হতে হবে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। বাংলাভাষায় তখন পর্যন্ত কোনো সংবিধান রচিত হয়নি, কোনো সংবিধানের বাংলা অনুবাদও আমাদের সামনে ছিল না। অতএব সামনে কোনো আদর্শ ছাড়াই আমাদের এগোতে হবে। ঢাকায় এসে কামালের সঙ্গে আলোচনার পর আমি আমার স্কুলজীবনের বন্ধু নেয়ামাল বাসিরকে এ কাজে টানলাম। সে তার আরেকজন সহকর্মীকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করল। তাঁর নাম ছিল বোধহয় আলম, নামটা ভুলে গেছি বলে লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। ঠিক হলো, আমরা তিনজন মিলে কাজটা করব। সংবিধান-প্রণয়ন কমিটির সভায় আমি আমন্ত্রণক্রমে উপস্থিত থাকব। সেখানে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষ্যই উপস্থিত করা হবে। আলোচনার পর উভয়পাঠের চূড়ান্ত রূপ স্থির করা হবে।



www.pathagar.com

আরম্ভের অথবা আরম্ভেরও আগে আরম্ভের দিনটার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। সচিবালয়ে আইনমন্ত্রীর অফিসকক্ষে এক বিকেলে ড. কামাল হোসেন ও আমি মুখোমুখি বসেছি। মন্ত্রণালয়ের প্যাডের কাগজে কামাল প্রিঅ্যাম্বলটা লিখতে শুরু করলেন। এক পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেলে প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে তিনি আমার দিকে দিলেন। আমি আরেকটা প্যাডের কাগজে লিখতে শুরু করলাম : 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ...।' সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হলো। পরদিন গণপরিষদ ভবনেই গেলাম সরাসরি। এখন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, সেখানে তখন গণপরিষদ এবং তার দপ্তর দুইই। আমার জন্যে একটা ঘর বরাদ্দ হয়েছে--আইনমন্ত্রীর ওখানকার দপ্তরের কাছাকাছি। আমার কাছেই সংবিধানের কাজের জন্যে নেয়ামাল ও তার সহকর্মীর ঘর সেখানেই বেশিরভাগ কাগজপত্র রাখা।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় কারিগরি সাহায্য করার জন্যে কমনওয়েলথ সচিবালয় থেকে মি. গাথরি নামে এক আইরিশ আইনজ্ঞকে পাঠানো হলো। তিনি আইনি মুশাবিদা-বিশেষজ্ঞ। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রাইভেট মেম্বরস বিল প্রণয়নকারী একটি আইনি সংস্থায় কাজ করেন। খুবই সজ্জন মানুষ। তিনি কামাল হোসেনের ইংরেজি খসড়ায় কিছু পরিবর্তন সাধন করেন, আমরা তা দেখে আবার বাংলাটা বদলাই। ইংরেজির বাংলা ভাষ্য যদি নিজেদের কাছে আড়ষ্ট লাগে, কামালকে বলি, ইংরেজির ধরনটা একটু পালটে দিতে। তিনি পালটে দেন। তাঁকে বলি কোনো বিধানের, কোনো আইনি শব্দের, তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দিতে। তিনি বুঝিয়ে দেন। আমরা কাজে অগ্রসর হই।

সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটি অনেকগুলো সভায় মিলিত হয়। সদস্যদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। তর্ক হয় জাতীয় সংগীত নিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নিয়ে, মৌলিক অধিকারের শর্তসাপেক্ষতা নিয়ে–এরকম অনেক কিছু নিয়ে। তর্ক হয় বাংলা ভাষ্য নিয়ে। আমরা স্পিকার-ডেপুটি স্পিকারের বাংলা করছিলাম অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ। একজন বললেন, ওতে একেবারে কলেজের প্রিন্সিপাল মনে হয়। জেনারেল ওসমানী একবার জিজ্ঞাসা করলেন, বাহিনীর অন্য কোনো বাংলা নেই? জানতে চাইলাম, কেন। বললেন, লালবাহিনী-নীলবাহিনী শুনতে শুনতে বাহিনী কথাটার ওপর অশ্রদ্ধা এসে গেছে; প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হয়। সংবিধান শব্দ কেন শাসনতন্ত্রের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, যে ব্যাখ্যা সবাই মেনে নেন। ওমবুডসম্যানের বাংলা ন্যায়পালও (এটি নেয়ামালবাসির-উদ্ভাবিত শব্দ) অনুমোদন লাভ করে কিছু আলোচনার পরে।


www.pathagar.com

একটা ভুল (সেটা আমারই) কিন্তু রয়ে যায়। ইউনিটারির অর্থে বাংলায় লিখেছিলাম একক, যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যবইতেই আছে এককেন্দ্রিক। আসলে কেন্দ্র শব্দটিতে অরুচি ধরে গিয়েছিল পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে, তাই সেটা এড়াতে একক করি। পরে আতাউর রহমান কায়সার ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথাটা উত্থাপন করেছিলেন আমার কাছে। তাঁকে এই জবাবই দিয়েছিলাম।

পরে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কমিটি গঠিত হয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে সভাপতি, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মযহারুল ইসলামকে সদস্য এবং আমাকে সদস্য-সচিব করে। এই কমিটি দুই সন্ধ্যায় বসে ইংরেজির সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা ভাষ্য অনুমোদন করেন। গণপরিষদে সংবিধান বিল উত্থাপনের সময়ে এই কমিটিকেই ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত নভেম্বরের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন শেষ হয়ে গেল। যখন লেখা হলো যে, বাংলা পাঠ মূল বলে গণ্য হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধ হলে বাংলা পাঠই প্রাধান্য পাবে, তখন বেশ ভয় পেয়েছিলাম মনে মনে। পরে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের এক লেখায় পড়েছি, ইংরেজি-বাংলার অসামঞ্জস্য নিয়ে নাকি দুটি মামলা হয়েছিল–তাতে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন, আসলে ইংরেজি-বাংলায় বিরোধ নেই।

১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ কালটা ঢাকায় থাকি। তাছাড়া এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসের অর্ধেকই ঢাকায় থেকেছি সংবিধানের বাংলা ভাষ্য প্রণয়নের কাজে। অনেক খেটেছিলাম। কখনো গভীর রাতে ঘরে না ফিরে কামালের বসার ঘরে রাত কাটিয়ে সকালে আবার এক সঙ্গে ফিরেছি গণপরিষদে। আমার সহকর্মী দুজনও খুব খেটেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান বাংলায় রচিত হবে, সেটাই হবে বাংলায় লেখা প্রথম সংবিধান এই লক্ষ্য গতি দিয়েছিল আমাদের কাজে।

সূত্র: ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত নিবন্ধ

• লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমীর সভাপতি



www.pathagar.com

# বাংলায় আইন রচনা

## কাজী এবাদুল হক

ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে কোম্পানির প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম এ দেশে বাংলা ভাষায় আইন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন ফার্সি ভাষায় রচিত অনেক আইন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তৎকালীন কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী ডানকান মেয়ার, অ্যাডমনস্টোন, ফরস্টার প্রমুখ। তৎকালীন প্রচলিত আইন বাংলায় অনুবাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন নিম্ন আদালতে আইনচর্চায় তৎকালীন আদালতের ভাষা ফার্সির সঙ্গে বাংলা ভাষায় আইনচর্চা হতে পারে। ১৮৩৭ সাল থেকে সরকারি ভাষা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি করা হলে এবং এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করলে বাংলা ভাষায় আইন গ্রন্থ রচনা কমে যায় এবং ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কয়েক বছর পর পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা উর্দুর সঙ্গে বাংলা স্বীকৃত হলে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষায়ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিধান করা হলে আইনের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আইনের বইপুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু হয়।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তার পরে বাংলা ভাষা চালু হবে–সে হবে না।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুর নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশের অফিস-আদালতসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার চালু হয় এবং সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে আইন-আদালতে বাংলা ব্যবহারের জোয়ার আসে।



www.pathagar.com

এমনকি হাইকোর্টের দৈনিক শুনানির তালিকাও বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকে। তখন থেকে বাংলায় আইনগ্রন্থ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মরহুম গাজী শামছুর রহমান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গাজী শামছুর রহমান দীর্ঘদিন নিম্ন আদালতের বিচারক হিসেবে কর্মরত থাকার সময় নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষায় আইনচর্চার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আদালতে যেসব আইন গ্রন্থের ব্যবহার বেশি, সে রকম প্রায় ৪০টি আইন গ্রন্থ তিনি রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন গ্রন্থ ছিল দেওয়ানি কার্যবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধি, যা আদালতে আইনচর্চায় একান্ত অপরিহার্য। তাঁর কতিপয় আইন গ্রন্থসহ বাংলা একাডেমী কিছু কিছু আইন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেযোগ্য আইন গ্রন্থ হচ্ছেঃ অধস্তন আদালতের ওপর একজন বিচারক, আবদুল হামিদ রচিত আইন কোষ এবং ঢাকার একজন লেখক রচিত ডি এফ মুল্লার মোহামেডান ল'র বাংলায় অনুবাদ। তা ছাড়া বিচারপতি কাজী এবাদুল হক রচিত বিচারব্যবস্থার বিবর্তন, ভূমি আইন ও ভূমিব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এবং নজির আইন সংহিতা উল্লেখযোগ্য। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত কানাডিয়ান সাহায্য সংস্থা সিডা'র অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত আইন শব্দকোষ একটি মূল্যবান আইনের বাংলা পরিভাষা গ্রন্থ।

এসব আইনগ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন লেখক আইনের অনেক গ্রন্থ, আদালতে আইনচর্চা-সম্পর্কিত গ্রন্থ, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, চাকরিসংক্রান্ত আইন প্রভৃতি বিষয়ে রচনাও প্রকাশ করেছেন এবং এখনো করছেন।প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইন গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করার জন্য কোনো ব্যবস্থা না হলে শুধু ব্যক্তি উদ্যোগে আইন গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষায় আইন গ্রন্থের অভাব পূরণ করা যাবে না। আইন-আদালতসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার চর্চা বিস্তৃত করার জন্য, বিশেষত আইন গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করার জন্য সরকারি উদ্যোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষায় প্রচলন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার যেসব আইন, বিধিবিধান, পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশ করছে, তা বাংলায় প্রকাশ অব্যাহত আছে।

সূত্রঃ ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত নিবন্ধ

• লেখকঃ আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি


www.pathagar.com

# জীবন নিয়ে হিসেব মেলাতে চাই না

## টি এইচ খান

আমাদের গ্রাম ছিল কংস নদীর পাড়ে।[১] সে সময় কংস নদী ছিল খরস্রোতা। নাব্যতা ছিল অনেক বেশি। ১২ মাস পানি থাকতো। গ্রামের নাম ঔটি, থানা হালুয়াঘাট। সমস্যা ছিল, কাছাকাছি কোনো স্কুল ছিল না। তখন আমার পরিবার এবং গ্রামের অন্যরা একটা স্কুল খুললো। বলা যেতে পারে, ঠিক আমাকেই লেখাপড়া করানোর জন্য। তারপর এমই স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলাম। সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা এমন অবস্থা ছিল পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় আমরা মাত্র দুই জন মুসলমান ছাত্র ছিলাম। আর ৩০-৩২ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের।

তারপর আসলাম ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। সেখানে থাকতাম হোস্টেলে। সেখানকার শিক্ষকরা ছিলেন অনেক জ্ঞানী। বিজ্ঞান, ইংরেজিতে তাদের পিএইচডি ছিল। তারা সুপিরিয়র ভিন্ন ইনফিরিয়র ছিলেন না। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। সুযোগ পেলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকার।

তখন রাজনীতিটা ছিল অনেক বেশি। ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন মরহুম ফজলুর রহমান। সালমান রহমানের বাবা। তিনি ছাড়া তখনকার দিনে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট তাদের সাথে কথা বলা ছিল মুশকিল। ফজলুর রহমান মুসলমানদের পক্ষে কথা বলতেন। এভাবে আমরা অনার্স পাস করলাম। তিন বছরের কোর্স।

বিএ অনার্স পাসের ফল প্রকাশের পর খবর জানাতে বাড়িতে যাব। ১৯৪৫ সাল, বিশ্বাস করেন একটা এটম বোমা পড়ল, জাপানের হিরোশিমায়। এর পরদিন বাড়ি যাচ্ছি। এটা নিয়ে কথা, আলোচনা হলো সারাদিন। রোজার দিন। শরীরে শক্তি ছিল। ট্রেনে ময়মনসিংহে পৌঁছে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করলাম। তারপর হাঁটা দিলাম গ্রামের বাড়ির দিকে। কাঁচা রাস্তা, কাদা, খালি পায়ে জুতা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি গেলাম। সন্ধ্যার সময় গিয়ে ইফতার করলাম। এটা আমার জীবনের বড় ঘটনা।



www.pathagar.com

এমএ-তে ভর্তি হতে দেরি হয়ে গেল। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের এক বন্ধু আমার ছিল, সে আমার নাম রেজিস্ট্রি করে রাখল। ল'টা আর নিতে পারলাম না। ল'য়ের জন্য এক বছর পিছিয়ে পড়লাম। এমএ পরীক্ষা সময়মতো দিয়ে পাস করলাম।

ল'এর জন্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে রয়ে গেলাম। আমি, ফরিদ আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, এমএ মুনিম (প্রধান বিচারপতি) আমরা একত্রেই প্রিলিমিনারি পাস করলাম রেগুলার টাইমেই। তারপর তো ৪৭ আসল। ফাইনাল পরীক্ষা আর হয় না। সম্ভবত, ৪৮ সালের ডিসেম্বরে পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা দিলাম এবং পাস করলাম। ইতিমধ্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল। হাইকোর্ট আসলো।

প্রথম হাইকোর্টের উদ্বোধনে সালেহ আকরাম (চিফ জাস্টিস), সাহাবুদ্দিন আইসিএস (মাদ্রাজ থেকে), জাস্টিস ওরমল (কলকাতায় প্রাকটিস করতেন, কলকাতায় জজ ছিলেন), জাস্টিস থমাস রোবার্ট এলিস, আমীরউদ্দিন আহমেদ আর আমীন আহমেদ–এই ছয় জন বিচারক নিয়ে হাইকোর্ট উদ্বোধন হলো।

ময়মনসিংহে কলেজে পড়ার সময় উকিল হওয়ার ইচ্ছা জাগতে থাকে। তখন তো কোর্টে যেতাম, ফ্লাওরিশিং লইয়ারদের দেখতাম তারা অনেক উঁচুমানের আইনজীবী ছিলেন। তাদের সম্পর্কে শুনেছি, উকিল মোক্তাররা আলাপ করতো, একটা বড় কেস নিলে তিনি ডায়েট কন্ট্রোল করতেন। ফল ফলাদি খেতেন। মক্কেলকে জেরা করতে হবে তার নোট করতেন, একটা কেসের বেশি দু'টা কেস নিতেন না। এটা দেখে আমি খুব অনুপ্রাণিত হতাম। এখান থেকে আমার একটা ধারণা জন্মালো। তারপর যখন হাইকোর্ট আসলো তখন তো আর কথাই নাই। এক ডিসিশন। ইতিমধ্যে আমার সনদ হয়ে গেছে, আমি লেকচারিও করি, সিনিয়রের চেম্বারেও যাই আবার হাইকোর্টেও যাই। এই অবস্থা খাইয়া না খাইয়া।[২]

কোনোদিন সামনে বাড়া ভাত খাওয়া যায়নি, দায়িত্ব জ্ঞানের কারণে। এখান থেকে কাজ করতে করতে আমি এজিপি হয়ে গেলাম। পরে জিপি হলাম। তখন এখানকার অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন আসরারুল হোসেন। তারপর উনি গেল গা রান অফ কেচে। ডিএলআর সাহেবও জজ হয়ে গেলেন। তখন আমি জিপির পদসহ এই তিনটা পদ ১১ মাস চালিয়েছি।

অন্যদের সাথে আমিও হাইকোর্টের জজ নির্বাচিত হলাম। কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে আই ওয়াজ হেল্ড আপ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা


www.pathagar.com

যখন চলছে তখনই ঘোষণা হয়ে গেল–কিন্তু আমি পদ পেলাম ১৯৬৯ সালে। তারপর শেখ সাহেব আসলেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। একটা প্রেসিডেন্ট অর্ডার ১১৩ করলেন। তারপর তো আমাদের কয়েকজনকে রিটায়ার করিয়ে দিলেন।[৩]

আমি আইন পেশাতে ফিরে আসলাম। তো একদিন প্রশ্ন উঠলো, বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের কোর্টে। তো আমি বললাম, আই ওয়াজ নট দ্য জাজ অব দিস কোর্ট। আই ওয়াজ দ্য জাজ অব ডিফারেন্ট কোর্ট, ইস্ট পাকিস্তান কোর্ট। আমি পাকিস্তানের জজ ছিলাম। বাংলাদেশের জজ না। কাজেই আমার প্রাকটিস করতে কোনো বাধা নেই। সেটাই টিকল। তখন থেকে প্রাকটিস করতে লাগলাম। প্রাকটিস করতে করতে একটা সময় আসলো, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পরে অনেকেই উপদেষ্টা হচ্ছেন জিয়াউর রহমানের। তো আমার কাছেও আসলো; কিন্তু আমি বললাম– আমি অ্যাডভাইজার হবো না।

তারপর যখন মন্ত্রিত্ব পেলাম, তখন প্রথম তো আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। সাত্তার সাহেব শাহ আজিজের প্রতি সুখী ছিলেন না। তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মিস ম্যানেজড হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাকে আইন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া হলো। সাথে সাথে স্পোর্টস আসল। তারপরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলাম। সাত্তার সাহেব এতো বিশ্বাস করতেন আমাকে।[৪]

১৯৯৫ সালে রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালে আমি সুযোগ পেলাম। এর আগে যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল হয়ে গেছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে তারা নির্বাচন করতো। ১৯২ সদস্যের যে ইলেকশন হয়েছিল সেখানে আমি নির্বাচিত হলাম এই অঞ্চল থেকে। আমার সাথে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া আর নেপালের প্রার্থী পরাজিত হলেন। এই দায়িত্ব পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। আমাদের একটা ছোট্ট দেশ। এখান থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নামটা জানতে পারলো সবাই। খুবই ভালো লাগত।[৫]

প্রায় ৯০ বছর বয়সে এখনো এত প্রাণশক্তি নিয়ে কাজ করছি। এখনো কোর্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেস করি। সহজ কেস তো আর আমার কাছে আসবে না। এটা আল্লাহর রহমত। এখনো প্রায় দিনই কাটে না খেয়ে। রুটি টুটি খেয়ে। কারণ সময় পাই না। কোর্টে খাওয়া যায়; কিন্তু সময় পাই না। আবার কখনো কোর্টের চিন্তায় খাওয়া যায়ও না।

তখনকার দিনে মাত্র ৮-৯ জন বিচারক ছিলেন। এখন তো প্রায় একশ বিচারক। এটার একটাই উত্তর। আমার বাড়ির উপরে লাইব্রেরি। তখনকার


www.pathagar.com

দিনে ঢাকা ল' রিপোর্টস (ডিএলআর)-এর চেহারা ছিল (হাতে দেখিয়ে মোটা অর্থে) এরকম। সুপ্রিম কোর্টের ভলিউম ছিল এরকম। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ডিএলআর ছিল এতো মোটা। এখন তো আমাদের ডিএলআর হাইকোর্ট আর সুপ্রিমকোর্ট মিলিয়ে (প্রায় একশ' বিচারকের জন্য) হয়ে গেছে কঙ্কালের মতো। আর ভেতরে যে রায়গুলো আছে এগুলো পড়ার মতো না। কলকাতার জজরা এগুলো দেখে নাক সিঁটকাবেন। এই আমার অভিজ্ঞতা।

নব্বই বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে কি পাইলাম আর কি হারাইলাম এই হিসাব মিলাইতে মনো মোর নহে রাজি।

অনুলিখন: শাওন মাহফুজ, স্টাফ রিপোর্টার, এটিএন নিউজ

১. *বিচারপতি টি এইচ খানের জন্ম ১৯২৪ সালে ময়মনসিংহে।*

২. *১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন।*

৩. *১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারক হন টিএইচ খান। ১৯৭১ সালে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি।*

৪. *তিনি ১৯৭৯ সালে সংসদ সদস্য হন এবং ১৯৮১ সালে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।*

৫. *১৯৯৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডার বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান।*



www.pathagar.com

# কোম্পানি আইনের বইটি হবে আমার এপিটাফ

## এম জহির

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন আগে আমি জন্মেছি কলকাতার ভবানিপুরে। সাধারণত বাচ্চাদের জন্ম হয় নানার বাড়িতে, কারণ মা যায় বাবার বাড়ি। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছে ভবানিপুরে পুলিশ হাসপাতালে। সেখানে আমার নানা আর্মির চিকিৎসক ছিলেন। পরে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। কলকাতার দাঙ্গার সময় ১৯৪৬ সালের আগস্টে আমরা পার্ক সার্কাসে আসলাম। সেখানে থাকার পরে আমার আব্বা (পরে বিচারপতি) আসির কলকাতায় থাকার চিন্তা করেছিলেন, বাড়িও কিনেছিলেন ৪৭ সালে। তবে, ৫০ এর দাঙ্গার পরে তিনি এদেশে চলে আসেন। কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দু মুসলিমদের হত্যার চিত্র দেখেছি। শুধু হিন্দু বা মুসলিম হওয়ার কারণে মারা হত।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে আমার বাবার ভাল পরিচয় ছিল। ঈদের সময় তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। ১৯৪৮ সালের দিকে কলকাতায় একদিন ঈদের সময় তিনি আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি বললেন, 'খোকা, তোমার আব্বা বাড়িতে আছেন।' আমি বললাম, 'নেই।' তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম কি?' তিনি চুপ করে থেকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, 'বলো, বেড়াল এসেছিল।' আম্মা আমাকে বললেন, 'কে এসেছিল।' আমি বললাম, 'বেড়াল।' তিনি দৌড়ে গিয়ে দেখলেন, 'শেরে বাংলা গাড়িতে উঠছেন।' এটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় স্মৃতি। তিনি কেএম দাস লেন থেকে নারিন্দায় যখন আসতেন তখন আমাদের বাসায় প্রত্যেক ঈদে আসতেন।

কলকাতায় পড়তাম হিন্দুদের সাথে। ভবানিপুরে একটা ভাল স্কুলে পড়তাম। পুরো বাংলায় দশটা প্লেসের মধ্যে প্রায় পাঁচটা সেখান থেকে থাকত। পার্ক সার্কাসে চলে আসার পর ভাল স্কুল পেলাম না। পরে ঢাকায়



www.pathagar.com

এসে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি হলাম। সেখানে আমেরিকানদের বেতের বাড়ি খেয়ে 'বাবু ইংলিশ' বের হয়ে গেল। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম তিনটাতে লেটার মার্কসহ স্টার। আই-এ পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ সালে ইংরেজিতে সম্মান সহ ভর্তি হয়েছিলাম।

আব্বা আমাকে পাস কোর্সে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজের সাথে ছিল। ফাদার মার্টিন আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দেব কিন্তু তোমার ক্লাসের রফি (পরে ব্যারিস্টার) এবং মইনুর রেজা চৌধুরী (পরে প্রধান বিচারপতি)–এদেরকে তুমি নিতে পারবে না। আমি তাদের না নিয়ে ইংরেজিতে চলে গেলাম। সেখানে অনার্স, মাস্টার্স করলাম। আইন পাশ করে অ্যাডভোকেট হলাম। ১৯৬২ সালে আমি এনরোল হই। তারপর বিলেত গিয়েছি।

আব্বার খুব বেশি বিশ্বাস ছিল না যে, আমি বিদেশ গিয়ে পাস করতে পারব। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার ও এলএলএম পাস করলাম। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৬ সালে কোম্পানি আইনের ওপর পিএইচডি করলাম। ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে খণ্ডকালীন লেকচারার হলাম। '৬৭-এর জানুয়ারিতে বিয়ে করলাম। প্রাকটিস শুরু করতে হলো। দেশ উত্তাল হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আসল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। আমি আর আমীর-উল ইসলাম হেবিয়াস করপাস রিট করলাম। স্যার টমাস উইলিয়ামসকে আনলাম। তিনি আমার সাথে রিহার্সেল করলেন এখনকার হোটেল রূপসী বাংলায় বসে। আগরতলা মামলায় প্রথমে আমরা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তখন ক্যান্টনমেন্টে যাইনি। কারণ আমাকে বলল, যারা যারা যায়নি, তাদের মামলাগুলো আমি দেখব ঢাকা হাইকোর্টে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রায়াল চলে আসল। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে প্রায়ই যেতাম। বঙ্গবন্ধু অনেক বড় হৃদয়ের ছিলেন। আগরতলা মামলা থেকে ফিরে আসার পর তার সাথে ক্লোজ হই। একাত্তর সালের মার্চে ওনার সাথে আমার সখ্যতা আরো বাড়ে।

একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কোথাও যাইনি। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে রুমি, কর্নেল জামানের ছেলে নাদিমকে বাসা থেকে নিয়ে আমি আর সিদ্দিক (এখন মারা গেছে) সেন্ট্রাল রোডে একটা বাড়িতে আসলাম। সেখানে রুমি আসল। তারপর একেবারে আর্মির নাকের ডগা থেকে তাদের পার করলাম। আমার আব্বার ভালো চেহারার কারণে একাত্তরের ২৬শে মার্চ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম।


www.pathagar.com

আর্মিরা আমাকে বলল, ইউ কাম এন্ড সো আস। বললাম, আমি তো যাবই না। বলে, হোয়াই নট, গেট বন্ধ ছিল। আমি বললাম আই ডোন্ট হ্যাভ কারফিউ পাস। মারার মতো অবস্থা। আব্বা বেরিয়ে আসলেন। আব্বার চেহারাও ছিল মাগরিবি। ওসব দেখে আমাদের ছেড়ে দিল। সেদিন যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা আর ফেরেনি। কিছুদূর নিয়ে গিয়েই মেরে ফেলত। তখন তো আমার মাথায়ই আসেনি আল বদর, আল শামস এগুলো হবে। আমি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ঘৃণা করেছি। সহযোগিতা করিনি। গেলে আমাকে মেরে ফেলত। আমি অবশ্য পাক বাহিনীকে বিশ্বাস করিনি। আমার চিন্তা মেরে ফেললে এখানেই মারুক। আমার এক বন্ধু গিয়েছিল। তাকেও মেরে ফেলেছিল।

আমার বাবা বলতেন, কংগ্রেসের মধ্যে একটা গোপন কিছু আছে যেখানে ঢোকা যাবে না। তবে কংগ্রেসের জন্য তার সহানুভূতি আছে। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন। তিনি অবসর নেন ১৯৬৫ সালে। এক গ্রামে যেমন দুই পীর থাকতে পারে না, তেমনি বাবা আমাকেই এগিয়ে দিলেন। তবে, আমার একটু অসুবিধে হলে ওনার কাছে যেতাম। তখন আটজন বা নয়জন বিচারপতি ছিলেন। আমি বিচারপতি হইনি বাবার অবস্থা দেখে। অবসরের সময় বাবার পেনশন এক হাজার টাকা মাত্র। বঙ্গবন্ধু আমাকে '৭২ সালের মার্চে বললেন, 'তুমি কি হতে চাও? 'চাকরি করতে হবে'–আমি বুঝেছিলাম উনি কি বলতে চান। হয়ত, আমাকে বিচারপতি হতে বলতেন। আমার ওদিকে নজরই ছিল না।

বাবা অবসরের পর বেশির ভাগ সময় চুপচাপ থাকতে পছন্দ করতেন। আমি হাইকোর্ট থেকে আসার পর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন। পরামর্শ দিতেন। একটা বিষয় আমি ভুলতে পারব না। খুশি খুশি হয়ে আমি বললাম, 'ওমুক পরিচালকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। উনি, আমাকে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারশিপ দেবেন।' হঠাৎ তিনি ক্ষেপে উঠে বললেন, 'কি, ডায়রেক্টর দেবেন? অনলি আল্লাহ ক্যান গিভ ইউ।' যেটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। পঞ্চাশ বছর ধরে হাইকোর্টে প্রাকটিস করছি। এখন আমি বুঝতে পারি আসলে কেন যে মক্কেল আসে আর কেন যে আসে না। আমার বাবাই ছিলেন সঠিক। শুধু আল্লাহই জানেন, কাকে কি দেবেন। এটা আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া আমার বিশাল অর্জনের একটি। এস আর পাল আর দেবেশ ভট্টাচার্য কিভাবে কোর্টে অ্যাপ্রোচ করেন তা দেখতে তিনি বলেছিলেন।


www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা কিছুটা মনে আছে। ১৯৬১ সালের দিকে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের মেয়ের বিয়েতে এসে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন তিনি আব্বাকে বলেছিলেন, 'আইয়ুব ডাজ নট রিয়েলাইজ, আনলেস দেয়ার ইজ ডেমোক্রেসি, পাকিস্তান উইল ব্রেক। মুজিব এন্ড আদার্স ওয়ান্ট টু ব্রেক পাকিস্তান। আই এ্যাম হোল্ডিং ইট। আই ক্যাননট। ইফ দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি পাকিস্তান উইল ব্রেক। এতো দূরদর্শী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

আরেকটি মজার ঘটনা, বঙ্গবন্ধুর গাড়িকে আমি ধাক্কা মেরেছিলাম। একবার গাড়ি ব্রেক ফেল করে। একটা রিকশাকে ধাক্কা মেরে সামনে আরেকটা জিপ গাড়িকে ধাক্কা মেরে আমি বসে থাকলাম। ছেলেরা এসে আমার গাড়ির নম্বর লিখে নিল। তখনো জানতাম না, কার গাড়ি। ১৯৬০-৬১ সালের কথা। পরে বাসায় গিয়ে দেখি দুই ভদ্রলোক। একজনের স্বাস্থ্য অনেক। আমার বাবা বললেন, এই যে আমার ছেলে। তখনই দেখলাম বঙ্গবন্ধুকে। আমাকে বললেন, কিসে পড়। বললাম ল'তে পড়ি। ব্যারিস্টারি পড়ছ, ভালো। কোয়ালিফাইড হয়ে আমার কাছে এসো। বঙ্গবন্ধুর গাড়িকে আমি ধাক্কা মেরেছি– ভাবতেই কেমন লাগছে!

একবার একজন মক্কেল আসলেন, একটা সমস্যার জন্য। আমি তাকে বললাম, আপনাকে কে পাঠিয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে এস আর পাল পাঠিয়েছেন কোম্পানী ল'জ সমস্যার জন্য। আমি তো পারলে তার পায়ে গিলে সালাম করি। আমি ভেবেছিলাম তিনি আমার শিক্ষক। উল্টো তিনিই আমাকে দেখিয়ে দিলেন। এই হচ্ছে তাদের উদার মানসিকতা। এখন সেটা নেই বললেই চলে।

ফরিদপুরের একটি মামলা, ১৮৮২ সালে দুই জমিদারের ঝগড়া হলো। হতে হতে জমিদারি বাউন্ডারি দেয়া হলো। ১৯২০ সালে সেই ঝগড়ার সমাধা হলো। ১৯৪১ সালে আবার ঝগড়া শুরু হলো। মামলা করতে করতে পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টে গেলো। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই মামলার একদল লোক আমার কাছে আসলো। আইল নিয়ে সমস্যা হলো। কোথায় ছিল ওখানে, সেটা মাপজোক হবে। '৭০ সালে তারা একথা বলে চলে গেলেন। তারপর '৭১ এলো। '৭৪ সালে মামলাটা আবার আসলে এস আর পাল ওদিকে আর আমি এদিকে। অনেক মানুষের সাথে কথা বলছিলাম। ভয়ও লাগছিল। হঠাৎ এস আর পাল আমাকে বললেন, এই চুপ চুপ। তাকিয়ে দেখি জাস্টিসরা বসেছেন। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আর এরই মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েন জাস্টিস জাবির। প্রধান বিচারপতি সায়েম


www.pathagar.com

মাথা ধরে বসে আছেন, 'আর বলছেন, ও ব্রাদার।' জাবির সাহেবের এই অবস্থা দেখে আমি দেয়াল ডিঙিয়ে গেলাম। গিয়ে জাস্টিস জাবিরের গলার কলার ছিঁড়ে ফেলে হাতে থাকা বই দিয়ে বাতাস করি কিছুক্ষণ। এর মধ্যে তার জ্ঞান ফেরে। আমার কাছে মনে হয়, 'লিগ্যাল হিস্টোরিতে আমিই প্রথম মানুষ যিনি বার ডিঙিয়ে গিয়েছিলাম।' মামলা তো ওখানেই শেষ। তারপরতো ১৯৭৮ সালে মামলাটা নিষ্পত্তি হয়েছিল।

গিটার বাজিয়ে সময় নষ্ট করতাম। পালিয়ে এখানে ওখানে বাজিয়ে বেড়াতাম। তারপর একবার এডভোকেট হওয়ার পরে ১৯৬১ অথবা ৬২ তে পল্টন ময়দানে গিটার বাজিয়েছি। তারপর আমার সিনিয়র ও প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন আমাকে যা বকা দিয়েছেন। বলেছিলেন, অ্যাডভোকেট হয়ে পল্টন ময়দানে তুমি গিটার বাজাও, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। তারপর থেকে গিটারটা বাইরে কম বাজিয়েছি। এখন হয়ত এক বা দুই ঘন্টা প্রাকটিস করি। লন্ডনে একবার মোহাম্মদ রাফির সঙ্গে গিটার বাজিয়েছিলাম। ওনার গিটারের হ্যান্ড কম হয়েছিল, সেই সুযোগটা নিয়েছিলাম। মোহাম্মদ রাফির মতো মানুষের সাথে গিটার বাজানো আমার জীবনের অন্যতম একটা অর্জন। হাইকোর্টে অনেক বড় বড় আইনজীবী আছেন, তারা হয়ত বলতে পারবেন এটা করেছি, ওটা করেছি; কিন্তু এই সুযোগ আমার জন্য অনেক বড় অর্জন। তা কেউ বলতে পারবে না।

টেনিসই আমাকে আরেকটা সুযোগ দিল। টেনিস কোর্টেই আমি অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সুযোগটা পেয়েছিলাম। কোনো একটা কারণে আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। টেনিস কোর্টে অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে চাকরির কথা বলেছিলাম। তারপর আমি আবেদন করলাম। মনেই ছিল না। তার তিন চার মাস পর একটা জবাব আসল অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা থেকে। দুটো শর্ত দিল আমাকে–সেখানকার ইমিগ্রেশন নিতে হবে আর তাদের হাইকোর্টে অ্যানরোলমেন্ট নিতে হবে। এরপর আমি এক মিনিটে এনরোলড হয়ে গেলাম। তারপর ওখানে চলে গেলাম। কোম্পানি ল' আর সিকিউরিটিজ ল'-এর ওপরে আমাদের কাজ ছিল। সেখানে সিকিউরিটিজ লজ' অব অস্ট্রেলিয়া ড্রাফট করেছিলাম। সেখানে সিকিউরিটিজ ল' নিয়ে কাজ করতাম। তারপর একবার আব্বার স্ট্রোক হলো। আমি চলে আসলাম। তারপর থেকে আসতাম, আবার যেতাম। এরপর ১৯৯১ সালের পরে আমি খুব কম যেতাম।

কোম্পানী আইনের ওপরে একটা বই লিখেছি। আশা করছি, মরে গেলে হয়ত বইটা অন্য উকিলদের ঘরে থাকবে। এটাই হবে আমার এপিটাফ।


www.pathagar.com

এখন পর্যন্ত ওটাই আমার হাতে লেখা ভাল একটা বই। আইনজীবীরাও সেটা অনুসরণ করেন। তবে মাহমুদুল ইসলামের সংবিধান নিয়ে লেখা বইও আইনজীবীসহ সবার কাছে জনপ্রিয়। আমি প্রকাশ্যে বলতে পারি, তিনি আমার চাইতে বেশি লেখাপড়া করেন। অনেক জ্ঞানী লোক।

একটি আফসোস দিয়ে শেষ করতে চাই। হেমন্তের গান আমার খুব প্রিয়। আমি একবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছি। সেবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দরবন হোটেলে। আমার এক চাচাত বোন হেমন্তকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাকে সামনা-সামনি দেখতে পারিনি। দ্যাট ওয়াজ দি বিগেস্ট মিসটেক অব মাই লাইফ।

আজ আমার জীবনের পশ্চিম আকাশ লাল। ওপারের ডাকের অপেক্ষায়। তবু বলে যাই–
আবার যদি আসে ফাল্গুন
শিমূল শাখায় লাগে আগুন
তখন আবার স্মরণ করো
অচিন সাথীটিরে–
দেখা হবে আবার
যদি ফাল্গুন আসে গো ফিরে।।

• লেখক: সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও কোম্পানি আইন বিশেষজ্ঞ

অনুলিখন: শাওন মাহফুজ, স্টাফ রিপোর্টার, এটিএন নিউজ


www.pathagar.com

# আমাদের সংবিধান কতটুকু জনস্বার্থমূলক

## আসিফ নজরুল

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক দলিল ছিল আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যা ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রকাশ করা হয়। ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান রাজনৈতিক দলিল। এর সঙ্গে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বর্ণিত অন্তত তিনটি মূলনীতির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন : ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় জনগণের ম্যান্ডেটের কথা যেভাবে বলা আছে তা গণতন্ত্র, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উল্লেখ- সমাজতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের উল্লেখ জাতীয়তবাদের ইংগিতবাহী বলা যায়।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন এবং পূর্ণাঙ্গ একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই বঙ্গবন্ধু এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ২২ মার্চ, ১৯৭২ অনুসারে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই অঞ্চলের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিজয়ী সদস্যরাই গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। গণপরিষদ ১০ এপ্রিল ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ৪ নভেম্বর সংবিধান গ্রহণ করা হয়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকর করা হয়। এর আগ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশ শাসিত হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১১ জানুয়ারী ১৯৭২ দ্বারা।

১৯৭২ সালের সংবিধানটির শিরোনাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।



www.pathagar.com

এটি মূল বা আদি সংবিধান হিসেবে বহুল পরিচিত। এই সংবিধানে সূচীপত্র, প্রস্তাবনা এবং চারটি তফসিল রয়েছে। প্রথম তফসিল বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইনের তালিকা, ২য় তফসিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত এবং এটি বিলুপ্ত করা হয়েছে, ৩য় তফসিল শপথ ও ঘোষণা এবং ৪র্থ তফসিল-এ বর্ণিত হয়েছে ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী। সংবিধানের মূল অংশ এগারটি ভাগে বিভক্ত। পরে ১৯৭৩ সালে অতিরিক্ত একটি (নবম-ক: জরুরী বিধানাবলী) ভাগ সংযোজন করা হয়। মূল এগারটি ভাগে অনুচ্ছেদের সংখ্যা ১৫৩ টি। সংবিধানের এই ১১টি ভাগে মূলত প্রজাতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার ও সরকারের মূল তিনটি অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সাংবিধানিক অঙ্গসমূহ এবং জরুরী অবস্থা, সংশোধন ও বিবিধ বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৩ সালে। এরপর আরো পনেরটি সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

**ক) প্রস্তাবনা** : বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুসারে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাংবিধানিক প্রাধান্য ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ৪টি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে সেগুলো ছিল : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৭৭ সালে প্রস্তাবনার শুরুতে বিসমিল্লাহ যোগ করা হয় ও ২টা নীতি পরিবর্তন করা হয়। যা হলো- প্রথমত: ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস; দ্বিতীয়ত সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার। ২০০৯ সালে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানে পুনঃস্থাপিত করা হয়।

**খ) প্রথম ভাগ :** সংবিধানের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের সংবিধানের প্রাধান্য তুলে ধরা হয়। ১৯৮৮ সালে এই ভাগে ২(ক) অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়। সেখানে এখন বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মেরও সমান মর্যাদা ও অধিকার থাকবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬-এ উল্লেখ রয়েছে বাংলাদেশের


www.pathagar.com

নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলে পরিচিত হবে। ১৯৭৭ সালে ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন বাঙ্গালীর স্থলে বাংলাদেশী পরিচয় ঢোকানো হয়। পনেরতম সংশোধনীতে নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী ও জাতিগত পরিচয় হিসেবে বাঙ্গালী সংযোজন করা হয়।

**গ) দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) :** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র প্রয়োগ করবে এবং সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে নির্দেশক হবে; কিন্তু উক্ত নীতিসমূহ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না। আগেই বলা হয়েছে ১৯৭২ সালের ৪টি মূলনীতি ১৯৭৭ সালে পরিবর্তন করা হয়। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে আবার এই চারটি মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়।

**ঘ) তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার) :** এই অংশে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশনের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য। এসব অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের কারণ জানার অধিকার, আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার অধিকার এবং একই সময়ের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার বাধ্যবাধকতা। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৩নং অনুচ্ছেদে গ্রেফতার, আটক ও বিচার সম্পর্কে এভাবে রক্ষাকবচ নিশ্চিত করলেও ১৯৭৩ সালে সংযোজিত নিবর্তনমূলক আটকের বিধান যোগ করার মাধ্যমে উপরোক্ত রক্ষাকবচকে অস্বীকার করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১ম সংশোধনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) ও ৪৭(ক) সংযোজন করা হয়।

**ঙ) চতুর্থ ভাগ (নির্বাহী বিভাগ) :** ১৯৯৬ সালে ১৩ম সংশোধনের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) থেকে ৫৮(ঙ) সংযোজন করা হয়। এটার মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তন করা হয়। পনেরতম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বিলুপ্ত করা হয়।

**চ) পঞ্চম বিভাগ (আইন সভা) :** ৬৮নং অনুচ্ছেদে সংসদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্যতা সমূহ বর্ণিত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের বর্ণিত অযোগ্যতা সমূহের মধ্য হতে ১৯৭৫ সালে একটি প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে দ্যা বাংলাদেশ কোলাবরেটর (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২-এর অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ততার উপর ভিত্তি করে বর্ণিত অযোগ্যতা বাদ দেওয়া হয়। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে এটি সংবিধানে পুনঃস্থাপিত করা হয়। ১৯৭২ সালে সংবিধানের ৭২নং অনুচ্ছেদে সংসদের


www.pathagar.com

অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহের কথা বলা হয়েছে। স্থায়ী কমিটিসমূহ খসড়া বিল সমূহকে পরীক্ষা করবে,আইনের বলব্যযোগ্যতা নিরীক্ষা করবে এবং মন্ত্রণালয় সমূহের কার্যক্রম তদারকি করবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে প্রথম বৈঠকে এই কমিটিগুলো গঠনের বাধ্যবাধকতাকে বাদ দেওয়া হয়।

**ছ) ষষ্ঠ ভাগ (বিচার বিভাগ) :** ১৯৭২ সালে ৯৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে সব নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শের কথা বলা হয়েছে। এবং ১৯৭৭ সালে পরে সব নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭২ সালে ১১৫ নং অনুচ্ছেদে জেলা জজ কর্তৃক নিয়োগের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশের কথা বলা হয়েছে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে পিএসসি ও সুপ্রিমকোর্টের সুপারিশের কথা। কিন্তু ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে অধ:স্তন কোর্ট সমূহের নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭২ সালে ১১৬নং অনুচ্ছেদে অধ:স্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সুপ্রিম কোর্টের উপরে অর্পিত হয়েছিল। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বিধান বহুলাংশে পুনঃস্থাপিত হয়।

**জ) নবম-ক ভাগ (জরুরী বিধানাবলী):** ১৯৭২-এর সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোন বিধান ছিল না। ১৯৭৩ সালে ২য় সংশোধনের মাধ্যমে এই বিধান সংযোজন করা হয়। জরুরী অবস্থা চলাকালে কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয় এবং কোন কোর্ট-এর মাধ্যমে উক্ত অধিকার সমূহ বলবৎ করা যায় না।

**ঝ) সংবিধানের সংশোধন :** ১৯৭২ সালের ১৪২নং অনুচ্ছেদে কোন সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন গণভোটের বিধান ছিল না। কিন্তু ১৯৭৮ সালে সংশোধনের মাধ্যমে গণভোটের বিধান করা হয় রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে (অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮) ও অনুচ্ছেদ ৫৬ (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী সমূহ এর ক্ষেত্রে )। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বিধান বহুলাংশে পুনঃস্থাপিত হয়।


www.pathagar.com

## সংবিধান জনস্বার্থমূলক কিনা তার মূল্যায়ন করা যায়

- সংবিধানের নির্বাচিত কয়েকটি অনুচ্ছেদ আলোচনা করে
- বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকে একে বিবেচনা করে।
- অন্যান্য সংবিধানের সঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা করে।

### *সংবিধান মানুষের অধিকার ও স্বার্থকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে*

ক) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার:

মূলত এগুলো সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। যেমন: কৃষক শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন, অবৈতনিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, জাতীয় সংস্কৃতি। এগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। যেমন: কেউ না খেয়ে মারা যাওয়ার অবস্থা হলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। রাষ্ট্র স্বীকার করে যে এসব বাস্তবায়নের দায়িত্ব তার রয়েছে। কিভাবে তা হচ্ছে বা কতোটুকু হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনার বাধ্যবাধকতা সংবিধানে নেই। পাকিস্তান সংবিধানের ২৯(৩) অনুচ্ছেদে এই দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

এসব অধিকার আমাদের সংবিধানে যথেষ্টভাবেও বর্ণিত হয়নি। ভারতের সংবিধানে শ্রমিকদের জীবনধারনক্ষম ন্যূনতম মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার কথা বলা আছে। ভারতের সংবিধানে পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার কথাও বলা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে পরিবেশ রক্ষার কথা উল্লেখ ছিল না, পনেরতম সংশোধনীর মাধ্যমে তা সংযোজিত হয়।

খ) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার:

মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত। আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য। ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানের তুলনায় সীমিত। যেমন: মানব পাচার, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম এ দুটো দেশের সংবিধানে নিষিদ্ধ।

তাছাড়া আমাদের সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান অনেক বেশী কঠোর ও স্বৈরতান্ত্রিক। পাকিস্তান/ভারত এক সঙ্গে তিন মাস, আমাদের দেশে ছয় মাস। আমাদের দেশে সর্বমোট মেয়াদের উল্লেখ নেই, ভারত-পাকিস্তানে রয়েছে। ভারতে সর্বোচ্চ সর্বমোট মেয়াদ সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারণ করবে। পাকিস্তানে প্রথম ডিটেনশন ২৪ মাস ও দ্বিতীয় ডিটেনশন ৮ মাস। উপদেষ্টা পর্ষদের গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সমস্যা


www.pathagar.com

বেশী। পাকিস্তানে রিভিউ বোর্ড গঠন করবে প্রধান বিচারপতি, সদস্যদের সকলকেই বিচারক হতে হবে, ১৫ দিনের মধ্যে আটকাদেশের কারণ জানাতে হবে। ভারতে এডভাইসরি বোর্ডের সদস্যরা সকলেই বিচারক বা বিচারক হিসেবে নিয়োগযোগ্য।

গ) অধিকারের বাস্তবায়নঃ

হাইকোর্টের মাধ্যমে শুধু মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নযোগ্য। ভারতে ও পাকিস্তানে লিগ্যাল এইড রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট মৌলনীতি, যার বাস্তবায়ন আইন প্রণয়ন করে করতে হবে বলা হয়েছে। আমাদের দেশের সংবিধানে এর উল্লেখ নেই।

*সংবিধান সুশাসন কতোটা নিশ্চিত করেছে*

ক) নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

এই জবাবদিহিতা সংসদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সংসদের ন্যূনতম অধিবেশনের কথা বলা হয়নি। দুই অধিবেশনের মধ্যে ষাট দিনের বেশী বিরতি থাকবে না শুধু তা বলা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে কমপক্ষে ১৩০ কার্যদিবসের কথা বলা আছে। বাংলাদেশের সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবসে অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্যপদ চলে যাবে বলা হয়েছে। ভারত সংবিধানে এটি ৬০ দিন। এই ৬০ দিনের হিসেবের ক্ষেত্রে সেই মেয়াদকে গণ্য করা হবে না যখন সংসদ চারদিনের বেশী সময়ের জন্য স্থগিত আছে। বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদ সদস্যদের বাকস্বাধীনতার কথা বলা নেই, ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানে বলা আছে। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ পুনর্বিবেচনা করতে বলার অধিকার দেয়া হয়েছে।

খ) সংসদীয় কমিটিগুলোর ক্ষমতা

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রথম অধিবেশনেই কমিটি গঠনের কথা বলেছিল, চতুর্থ সংশোধনীতে এটি বাতিল করা হয়। সংসদ আইন দ্বারা কমিটিগুলোকে সাক্ষ্যদান ও দলিল হাজির করাতে বাধ্য করতে পারবে বলা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানে এক্ষেত্রে কমিটির নির্দেশ অমান্যকারীদের আদালতের মাধ্যমে শাস্তিদানের আইন করার কথা বলা হয়েছে।

গ) সংবিধান ও কালো আইন


www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে এ ধরনের কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার অধিকার সরকারী দলের সাংসদদের নেই। পাকিস্তানের সংবিধান অনুসারে ডিফেকশন বিধানটি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন, অনাস্থা ভোট ও অর্থবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাকিস্তান সংবিধানে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং নির্বাচন কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার বিধান রয়েছে, আমাদের সংবিধানে এ সম্পর্কে কিছু বলা নেই। ভারতে কেবলমাত্র ভোটদানের ক্ষেত্রে দলের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলে এবং তা বিনা অনুমতিতে লংঘন করলে (বিপক্ষে ভোট দিয়ে বা ভোটদানে বিরত থেকে) এবং দল থেকে তা ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষমা না করে দেয়া হলে সদস্যপদ চলে যাবে। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার দল থেকে পদত্যাগ করলে এটি প্রযোজ্য হবে না।

ঘ) যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের নির্বাচন প্রসঙ্গ

প্রার্থীদের যোগ্যতায় নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধের জন্য সাময়িক অনুপযুক্ততার কথা বলা হয়েছে শুধু। পাকিস্তানে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতিমূলক আচরণ, ঋণখেলাপী ও বিল খেলাপীদের অযোগ্যতার কথাও বলা আছে।

আমাদের সংবিধানে স্থানীয় শাসন ও ন্যায়পালের মতো সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা আছে। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়ন হয়নি। অন্য দেশে সাধারণত সংবিধান সংশোধনী হয় নাগরিক অধিকার ও স্বার্থকে সুনিশ্চিত করার জন্য। সুশাসনের সম্ভাবনা সুদৃঢ় করার জন্য। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করা হয় সরকারের ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য, অবৈধ ক্ষমতা আইনানুগ করার জন্য, ক্ষমতা দখলের জন্য। সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাবেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সংবিধান নিয়ে আলোচনায় এসব জরুরি বিষয় না তুলে ধরে মানুষকে বারবার বিভ্রান্ত করা হয়।

• লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



www.pathagar.com

# বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

## মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু

পাক-ভারত উপমহাদেশে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ধারণা প্রায় ১৮২ বছরের পুরাতন। তবে নীতিগতভাবে মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই পৃথকীকরণের বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। জনকল্যাণে প্রবর্তিত রাষ্ট্র কাঠামোর গোড়াপত্তন হয় খ্রীষ্টপূর্ব গ্রীক আমলে। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'Rule of Law and separation of power'-এরিস্টটল এ মূলনীতির লালনকারী অন্যতম একজন প্রবক্তা। এছাড়াও আধুনিক কালের অনেক আইন ও দর্শনের পণ্ডিতগণ এ নীতির পক্ষে জোরাল যুক্তি দিয়েছেন। প্রখ্যাত পন্ডিত ম্যাডিসন বলেন, 'The accumulation of all powers, legislative, executive and judicial in the same body whether of one, a few or many and whether hereditary, self-appointed or elective may justly be pronounced as the very definition of tyranny.' অর্থাৎ "আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার একত্র সমাবেশ এক ব্যক্তি বা কতিপয় বা বহুজনের হাতে হোক না কেন এবং তাঁরা বা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই হোন বা স্বনির্বাচিত হোন বা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন না কেন, তা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর" এরিস্টটল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। আধুনিক আইন বিজ্ঞানীগণও এই তিনটি বিভাগ : শাসন, আইন ও বিচার একই ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা নিরাপদ নয় মর্মে যুক্তি দেন। অনুরূপভাবে আইন প্রণয়ন ও বিচারিক ক্ষমতাও একই ব্যক্তির হাতে রাখা ঝুঁকিমুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে মহাপন্ডিত 'Montesquieu' তার প্রসিদ্ধ 'Spirit of laws' গ্রন্থে বলেন, The three powers then must



www.pathagar.com

be separated, exercised by different individuals in such a way as to act as checks and balances against one another.' তার মতে এই তিনটি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ একই কর্তৃপক্ষের নিকট রাখলে বিচারের সাথে প্রহসন হবে, শাসক তার খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে যাবে, আর সাধারণ মানুষের ব্যক্তি জীবন হয়ে পড়বে অনিশ্চিত ও যন্ত্রণাদায়ক।

অল ইন্ডিয়া জাজেস এসোসিয়েশন একটি রীট মামলা দায়েরপূর্বক বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করেছেন। নির্বাহী বিভাগ নীতিগত কারণেই কোন প্রকার বিচারিক কার্য নিষ্পন্ন করতে পারে না। রাষ্ট্রের তিন বিভাগের কোন বিভাগই অপরের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর একটি রায়ে বলেন : 'Under our Constitution, the Legislature, Executive and Judiciary all have there own broad spheres of operation. Ordinarily it is not proper for any of these three organs of the State to encroach upon the domain of another, otherwise the delicate balance in the Constitution will be upset, and they will be a reaction.'

'Rule of Law' মূলনীতির আলোকে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করে রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালীদের কোপানল থেকে বিচার প্রার্থীকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

আমাদের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'The State shall ensure the separation of the judiciary from the executive organs of the State.' অর্থাৎ "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে"।

দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কাজটি নিষ্পন্ন করা হয় নাই। একটি অশুভ শক্তি ও গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের কারণেই জনগণ তাদের আইনের সমান আশ্রয় লাভের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে।

পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ ভারতে সর্বপ্রথম বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার আলাদা করা হয়। এরপর ১৮৩৬ সালে 'লর্ড


www.pathagar.com

অকল্যান্ড' একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এর সদস্য ছিলেন 'ফ্রেডরিক হ্যালিডে'। তিনি বলেন, 'চোর যে ধরে, আর বিচার যে করে উভয় এক অবস্থানে থাকলে ন্যায়ের চেয়ে অনিষ্টই বেশি হবে।' ১৮৫৪, ১৮৬৮, ১৮৯৯ সালে একাধিক কমিশন এ উদ্দেশ্যই পৃথকীকরণ-এর রূপরেখা প্রণয়ন করেন; কিন্তু আমলাতান্ত্রিক কারণেই তা কার্যকর করা হয়নি। এরপর ১৯০০, ১৯০৫, ১৯০৮, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৪ এবং ১৯৩৫ সালে গঠিত একাধিক কমিশন এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট ও মতামত প্রদান করা সত্ত্বেও নানান অজুহাতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে একটি আইন (১৯৫৭ সালের ৩৬ নং ই.পি. আইন) পাস হয়। কিন্তু সে আইনটিও কার্যকর করা হয়নি। ১৯৫৮ সালে ল' কমিশন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের সরাসরি হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনার সুপারিশ করলেও তা কার্যকর হয়নি। ১৯৬৭ সালে গঠিত ল' কমিশন ১৯৫৭ সালের ৩৬ নং আইনটি বলবৎ করে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার কথা বললেও সেটিও কার্যকর করা হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের নিম্ন আদালত সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নির্বাহী বিভাগকে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন বিচার বিভাগ পৃথক করার সুপারিশ করেন; কিন্তু এটিও কার্যকর করা যায়নি। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান এক সামরিক ফরমান বলে সংবিধানের ১১৫-১১৬ অনুচ্ছেদকে প্রায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শের বিধানটি বহাল করেন। ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এর মতো বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের একটি বিল আনলেও তা কখনও আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৯০ সালে এদেশের তিনটি বড় রাজনৈতিক দল বিচার বিভাগ পৃথক করার সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান ও তা বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯৯২ সালে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার পরও কোন ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সমর্থ হননি।

১৯৯৫ সালে তৎকালীন মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে আন্তঃ ক্যাডার বেতন বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত


www.pathagar.com

কমিটির রিপোর্টে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়, যাতে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা গুরুতর বৈষম্যের শিকার হন। এই বৈষম্যের কারণে বিচারকদের মাঝে ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। এই অমর্যাদাকর বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পরিশেষে তদানীন্তন বি.সি.এস. (বিচার) এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ৪৪১ জন বিচারকের (পরে আরো বিচারক এ মামলার পিটিশনার হিসাবে পক্ষভুক্ত হন) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তদানীন্তন মহাসচিব মোঃ মাসদার হোসেন ১নং আবেদনকারী হিসেবে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২৪২৪/৯৫ নং একটি রীট মামলা দায়েরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই রীট মামলা দায়েরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট রয়েছে। তৎকালীন বি.এন.পি. সরকারের আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের ন্যায়সঙ্গত প্রত্যেকটি দাবির সাথে আমি একমত এবং এ বিষয়ে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু সরকারের নীতিগত কারণে আমি অপারগ। এই প্রেক্ষাপটে বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা দায়ের করতে গেলে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রীট মামলার ফাইলে অন্তরায় সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে সকল বিচারকগণ হতাশ হয়ে পড়েন। এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় নেতৃস্থানীয় ১৫/১৬ জন বিচারকসহ আমি নিজে সলিসিটর উইং-এ প্রবেশপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অসহযোগিতার বিষয়টি জানার চেষ্টা করি। কিন্তু তারা কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে সমস্বরে বলপ্রয়োগ করতঃ পিটিশনে তাদের স্বাক্ষর ও অনুমোদন প্রদানে বাধ্য করি। দায়িত্ব এড়ানোর জন্য অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ওই সময় নিজ নিজ দপ্তর থেকে পলায়ন করেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনার ফলেই বিচারকগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত রীট মামলাটি দায়ের করতে সমর্থ হন। মামলা দায়েরের পর পরই মহামান্য হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা বিচারকদের বেতন সমতা রক্ষা করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিলে অসন্তোষ কিছুটা প্রশমিত হয়। মাসদার হোসেন বি.সি.এস. (বিচার) এসোসিয়েশন-এর পক্ষ হতে মামলা দায়েরের দেড় মাস পর আমি এসোসিয়েশনের মহাসচিব হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় এই মামলাটি পরবর্তীতে পরিচালনার মূল দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (পরবর্তীতে বিচারপতি) জনাব আজিজুল হক। প্রসঙ্গত, একটি সত্য কথা না বললেই নয়, যা হল ওই সময়ে বিচারকের সংখ্যা ৬০০-এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও মামলার ওকালতনামায় অনেক নেতৃস্থানীয় বিচারক অজানা কারণে স্বাক্ষর করতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। যারা অপারগতা


www.pathagar.com

প্রকাশ করেছিলেন তারা পরবর্তীতে আইন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি হিসাবেও নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এই রিট মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় ১৯৯৫ সালে তৎকালীন আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ পঞ্চম সংসদে বলেন, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে কমিটিতে ৪৬টি মিটিং হয়েছে এবং অতিশীঘ্রই এই বিল মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। এ বিলটি এনেছিলেন আওয়ামী লীগের সাংসদ ও সাবেক মন্ত্রী জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ। ১৯৯৬ সালে আইনমন্ত্রী ও সাংসদ জনাব আব্দুল মতিন খসরু জানান, বিচার বিভাগ পৃথক করার একটি বিল প্রস্তুত হচ্ছে, এটি সংসদে পাস করা হবে; কিন্তু তা হয়নি। ১৯৯৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি আইন সচিব পৃথকীকরণের একটি প্রস্তাব করেন, কিন্তু নির্বাহী বিভাগের ভিন্ন প্রচেষ্টার কারণে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

ইতোমধ্যে ১৯৯৭ সালের ৭ই মে বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক ও বিচারপতি হাসান আমীনের দ্বৈত বেঞ্চ ২৪২৪/৯৫ নম্বর রীট (মাসদার হোসেন মামলা) মামলার রায় প্রদান করেন। ওই রায়ে বিচরপতিদ্বয় ৯ দফা বিশিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। ওই একই রায়ে বিচারপতি হাসান আমীন অতিরিক্ত আরো তিনটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করে রাষ্ট্রের তিনটির অন্যতম অঙ্গ বিচারকদের চাকরির ধরন, বিচারকদের সরকারী ক্যাডারভুক্তিকরণ, বিচারকদের বেতন-ভাতা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বলেন, The judicial service, is not service in the sense of employment. The Judges are not employees. As members of judicial service, they exercise the sovereign judicial power of the State under the Constitution. The Judge are not the judicial staff. The other service, in fact, exist which carry out the outcome of three pillars of the Constitution.

Other services i.e. cadre services of the Republic carry out the decisions of those three organs of the State as representatives of the executive (Council of Ministers) one of the pillars of the Constitution being staff of the Executive. So, natural corollary is that the judicial service cannot be equated with other services of the Republic and accordingly the


www.pathagar.com

inclusion of Judicial Service as one of the cadre services of the Republic vide. S.R.O. No. 2861/1/80/ED(IC) SII-92/80-02 dated 01.9.1980 (Annexure-A) is ultra vires the Constitution.

As such the "Judicial Service" shall be excluded from the above list which requires to be designated as "Judicial Service of Bangladesh" having no connection with other services of Bangladesh under direct control and supervision of the Supreme Court in view of separate, Clear and distinct nature of work of the member of the Judicial Service of Bangladesh.

In this connection it may be re-called here that inspite of provisions as set out in Article 115 of the Constitution, the President of the Republic has failed to make Rules regulation the appointment and conditions if service of persons in the service of the Republic and we are sure this kind of anomaly (treating the judicial service as one of the cadre services of the Republic) would not have taken place

had the Rules on this behalf been framed by the President.

By this time long quarter has passed and much water has flown through rivers of the country like Padma, Meghna and Jamuna and as such it is high time for the authority to give recognition to the separate identity of the **'Judicial Service of Bangladesh'** by making rules in view of their distinct nature of duties that a judge in called upon to discharge. Society's expectation of the conduct of the Judges, the life style of the Judges, the occupational hazard, to which he/she is exposed to


www.pathagar.com

the need to keep Judges above their essential wants.

This distinction between the Judges and members of other services has to be consistently kept in mind yet for another important reason. Independence of judiciary cannot be secured by making mere solemn proclamation about it. It has to be ensured both is substance and in practice. The society has a stake in ensuring independence of the judiciary and no price is too heavy to secure it. Considering the facts and circumstances we are of the view that not only the scale of pay as announced in the impugned Memo being S.R.O. No. অম/অধি (বাস্ত-১)বিবিধ-15/93/24 তাং 23-2-98 in respect of the judicial service (Annesure-E) should be retained but also the pay of judicial officers be substantially enhanced by constituting a separate pay commission in order to enable them (Judicial Officers) to maintain a proper standard of life and avoid obligations which may be embarrassing him in the discharge of his duties by making the judicial service separate from other Services of the Republic by making rules on this behalf.

এরপর হাইকোর্ট বিভাগের ওই রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে একটি আপীল দায়ের করলে ১৯৯৯ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি জনাব মোস্তফা কামাল সহ আপীল বিভাগের ৪ জন বিচারক (ফুল বেঞ্চ) সর্বসম্মতভাবে একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদানপূর্বক সরকারের আপীল অংশত খারিজ করে ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করতঃ তা বাস্তবায়নের আদেশ দেন। ওই ১২ দফা নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

**The Supreme Court**

Appellate Division (Civil)

Present:



www.pathagar.com

Mustafa Kamal, CJ

Latifur Rahman, J

Bimalendu Bikash Roy Choudhury, J

Mahmudul Amin Choudhury, J

Secretary, Ministry of Finance ..; Appellant

Vs.

Md. Masdar Hossain and others ...; Respondents

Judgment

December 2, 1999.

**Lawyers Involved:**

Mahmudul Islam, Attorney-General, instructed by Sharifuddin Chaklader, Advocate-on-Record; For the Appellant.

Dr. Kamal Hossain, Syed Ishtiaq Ahmed and Amir-ul-islam, Senior Advocates, instructed by Md. Aftab Hossain, Advocate-on-Record ; For Respondent Nos. 75, 133 & 183.

Not represented;Respondent Nos. 1-74, 82 & 184-223.

Civil Appeal No. 79 of 1999.

(From the Judgment and order dated 7-5-1997 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 2424 of 1995).

Judgment:

**Mustafa Kamal, CJ:** How far the Constitution of Bangladesh has actually secured the separation of the judiciary from the executive organs of the State and whether the Parliament and the executive have



www.pathagar.com

followed the constitutional path are the crux issues that fall to be determined in this appeal by leave by the Government appellant from the judgment and order dated 7-5-97 passed by a Division Bench of the High Court Division in Writ Petition No. 2424 of 1995.

75. We passed a short order on 2-12-99 on the conclusion of the hearing on 30-11-99 in the following terms: The appeal is partly allowed without any order as to cost. The direction of the High Court Divisi on with regard to payment of salary and other benefits will continue. Judgment containing directions, orders, observations and guidelines follows;.

76. The above are the observations, guidelines, elaborations and acceptance or rejection of some parts of the impugned judgment now we come to the operative part of our judgment reflecting the summary of our conclusions-

1) It is declared that the judicial service is a service of the Republic within the meaning of Article 152(1) of the Constitution, but it is a functionally and structurally distinct and separate service from the civil executive and administrative service of the Republic with which the judicial service cannot be placed on par on any account and that it cannot be amalgamated, abolished, replaced, mixed up and tired together with the civil executive and administrative service.

2) It is declared that the word "appointments" in Article 115 means that it is the President who under Article 115 can create and establish a judicial service and also a magistracy exercising judicial


www.pathagar.com

functions, make recruitment rules and all pre-appointment rules in that behalf, make rules regulating their suspension and dismissal but Article 115 does not contain any rule-making authority with regard to other terms and conditions of service and that Article 133 and Article 136 of the constitution and the services (Reorganisation and conditions) Act, 1975 have no application to the above matters in respect of the judicial service and magistrates exercising judicial functions.

3) It is declared that the creation of BCS (Judicial) cadre along with other BCS executive and administrative cadres by Bangladesh Civil Services (Reorganisation) Order 1980 with amendment of 1986 is ultra vires the Constitution, It is also declared that Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 are applicable to the judicial service.

4) The appellant and the other respondents to the writ petition are defected that necessary steps be taken forthwith for the president to make Rules under Article 115 to implement its provisions which is a constitutional mandate and not a mere enabling power. It is directed that the nomenclature of the judicial service shall follow the language of the Constitution and shall be designated as the Judicial Service of Bangladesh or Bangladesh Judicial Service. They are further directed that either by legislation on by Framing Rules under Article 115 or by executive order having the force of Rules a Judicial Services Commission be established forthwith with majority of members from the Senior Judiciary of the Supreme Court and the subordinate courts for recruitment to the Judicial Service on merit with


www.pathagar.com

the Objective of achieving equality between men and women in the recruitment.

5) It is directed that under Article 133 law or rules or executive order having the force of Rules relating to posting promotion, grant of leave, discipline (except suspension and removal), pay, allowances, pension (as a matter of right not favour) and other terms conditions of service, consistent with Articles 116 and 116A as interpreted by us, be enacted or framed of made separately for the judicial service and magistrates exercising judicial functions keeping in view the constitutional status of the said services.

6) The impugned orders in the writ petition dated 28-2-94 and 02-11-95 are declared to be ultra vices the Constitution for the reasons to the judgment. The appellant and the other respondents to the writ petition are directed to establish a separate Judicial pay Commission forthwith as a part of the Rules to be framed under Article 115 to review the pay, allowances and other privileges of the judicial service which shall convene at stated intervals to keep the process of review a continued one. The pay etc of the judicial service shall follow the recommendations of the Commission.

7) It is declared that in exercising control and discipline of persons employer in the judicial service and magistrates exercising judicial functions under Article 116 the views and opinion of the Supreme Court shall have primacy over those of the Executive.

8) The essential conditions of judicial independence in Article 116A, elaborated in the judgment,



www.pathagar.com

namely (1) security of tenure, (2) security of salary and other benefits and pension and (3) institution independence

from the parliament and the Executive shall be secure in the law or rules made under Article 133 or in the executive orders having the force of Rules.

9) It is declared that the executive Government shall not require the Supreme Court of Bangladesh to seek their approval to incur any expenditure on any item from the funds allocated to the Supreme Court in the annual budgets, provided the explained incurred falls within the limit of the sanctioned budgets, as more fully explained in the body of the judgment. Necessary administrative instructions and financial delegations to ensure compliance with this direction shall be issued by the Government to all concerned including the appellant and other respondents to the writ petition by 31-5-2000.

10) It is declared that the members of the judicial service are within the jurisdiction of the administrative tribunal. The declaration of the High Court Division to the opposite effect is set aside.

11) The declaration by the High Court Division that for separation of the subordinate judiciary from the executive no further constitution amendment is necessary in set aside. If the parliament so wishes it can amend the constitution to make the separation more meaningful, pronounced, effective and complete.


www.pathagar.com

12) It is declared that until the Judicial pay Commission gives its first recommendation the salary of Judges in the Judicial service will continue to be governed by states quo ants as on 08-01-94 vide paragraph 3 of the order of the same date and also by the further directions of the High Court Division in respect of Assistant Judge and Senior Assistant Judges. If pay increases are effected in respect of other services of the Republic before the Judicial Pay Commission gives its first recommendation the members of the judicial service will get increases in pay etc Commensurate with their special status in the Constitution and in conformity with their special status in the Constitution and in conformity with their special status in the Constitution and with the pay etc, that they are presently receiving.

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলামকে। আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে এ মামলা পরিচালনায় তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। তার এই ভূমিকা ছাড়া কোনভাবেই মামলা দায়ের ও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি বিচারকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আপীল বিভাগের ওই রায় অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে কিনা এটাই বিবেচ্য বিষয়। মাসদার হোসেন মামলার রায় এবং ১লা নভেম্বর ২০০৭ পৃথকীকরণ দ্বারা আক্ষরিক অর্থে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও বিচারকগণ নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়নি। স্বাধীনভাবে মুক্তমনে বিচার করার পূর্বশর্ত বিচারকদের আর্থিক স্বাধীনতা ও সচ্ছলতার বিষয়টিও খুবই প্রাসঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান সুপ্রীম কোর্ট বলেন, Independence of judiciary. The independence of judiciary is not limited only to the independence from the executive pressure or influence; it is a wider concept which takes within its sweep


www.pathagar.com

independence from any other pressure and prejudices. It has many dimensions, viz fearlessness of other power centres, economic or political and freedom from prejudices acquired and nourished by the class to which the judges belong. [ C Ravichandran Iyer V Justice A M Bhattacharjee (1995) 6 JT (SC) 339 at 352, 1995 SCC (Cr) 953 ].

এছাড়াও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার রায়ে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব হাসান আমীন আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, যা চূড়ান্ত রায়েও গৃহীত হয় : The pay of judicial officers be substantially enhanced by constituting a separate pay commission in order to enable them (Judicial Officers) to maintain a proper standard of life and avoid obligations which may be embarrassing him in the discharge of his duties by making the judicial service separate from other Services of the Republic by making rules on this behalf.

প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৪ সালে বিচারকগণ কতকটা বাধ্য হয়েই আদালতের শরণাপন্ন হন। অবকাঠামো, আবাসস্থল, যানবাহন, বেতন-ভাতা সব কিছুই নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বিচারকগণ মূলতঃ নির্বাহী বিভাগের অধীনেই ন্যস্ত ছিল। বেতন-ভাতাসহ ঐ সকল নানা সুবিধা বঞ্চিত হয়েই সমগ্র বাংলাদেশের বিচারকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ২৪২৪/৯৫ নং রীট মামলাটি দায়ের করা হয়।

পৃথকীকরণের রায় আজো পুরোটা কার্যকর করা হয়নি। এ মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদানের পর দীর্ঘ ৮ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় পৃথকীকরণের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করতে। নিম্নে ৮ বছরের কার্যক্রম ও স্তরগুলি উল্লেখ করা হ'ল।

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৯, আপীল বিভাগ সরকারের আপীল আবেদন না-মঞ্জুর করে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ১২ দফা নির্দেশনার আলোকে রায় বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে আদেশ দেন। ১৯ নভেম্বর ২০০২, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে খসড়া বিধিমালা তৈরি করে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দেয় আপীল বিভাগ। এরপর 'জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন' ২০০২,


www.pathagar.com

'জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন বিধিমালা' ২০০২, জুডিশিয়াল সার্ভিস (গঠন, নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা' ২০০২, জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান এবং চাকরির অন্য শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০২ এবং ফৌজদারী কার্যবিধির সংশোধনী আদালতে দাখিল করে সরকার।

২৬ জানুয়ারী ২০০৩, প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর খসড়া বিধিমালাগুলো অনুমোদন করে আপীল বিভাগ সরকারকে সময় বেধে দেন। ২৮ জানুয়ারি ২০০৪, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৪, গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করে সরকার। ১৩ এপ্রিল ২০০৪, আপীল বিভাগে ৩ জন সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে বাদী মাসদার হোসেন-এর পক্ষে পিটিশন দাখিল করা হয়। ২৯ নভেম্বর ২০০৪, আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে সরকারের ৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে না মর্মে শোকজ করেন। ১৯ জানুয়ারি ২০০৬, ১০ জন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ অমান্য করা ও রায়ের ভুল ব্যাখ্যার জন্য আদালত অবমাননার দরখাস্ত দাখিল করা হয়। ৩ এপ্রিল ২০০৬, ৪ জন সচিবের বিরুদ্ধে রায় অমান্যের অভিযোগে আদালত অবমাননার রুল ইস্যু করে আপীল বিভাগ। ২১ মে ২০০৬, জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন বিধিমালা ২০০৬ গেজেট নোটিফিকেশন করে সরকার।

১২ জুন ২০০৬, জুডিশিয়াল সার্ভিস (গঠন, নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৬ এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান এবং চাকরির অন্য শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০৬ গেজেট নোটিফিকেশন করে সরকার। তবে এসব প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে মানা হয়নি। ২৪ নভেম্বর ২০০৬, আপীল বিভাগ ২৬ জানুয়ারি ২০০৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারকে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে নির্দেশ দেয়। ১০ জানুয়ারি ২০০৭, সাতদিনের মধ্যে চারটি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশের নির্দেশ দেয় সুপ্রীমকোর্ট।

১৬ জানুয়ারি ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন বিধিমালা ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস (গঠন, নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান এবং চাকুরীর অন্য শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০৭ চারটি বিধিমালা এবং গেজেট আকারে প্রকাশ করে সরকার। ২ এপ্রিল


www.pathagar.com

২০০৭, কিছু ত্রুটি থাকায় জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস (গঠন, নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান এবং চাকরির অন্য শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০৭ এ তিনটি বিধিমালা সংশোধনী প্রকাশ করে সরকার। ২৬ এপ্রিল ২০০৭, জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর সংশোধনী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে সরকার।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনী গেজেট নোটিফিকেশন করে সরকার। ১১ ফেব্রুয়ারি অধ্যাদেশ নং ২, ২০০৭ এ মর্মে জারি করা হয় যে, "যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অন্যতম মূলনীতি; এবং যেহেতু উপরোল্লিখিত মূলনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্বাহী প্রকৃতির ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী পৃথকীকরণ এবং কতিপয় অন্যান্য বিষয়ের বিধান করার নিমিত্ত The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of 1898) এর অধিকতর সংশোধন কল্পে প্রণীত"। এ অধ্যাদেশে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৩৬, ৩৮ অনুযায়ী ৩, ৪ নং সিডিউল সংযুক্ত/প্রদানপূর্বক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়।

১০ এপ্রিল ২০০৭, ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনী প্রকাশ। ৭ মে ২০০৭, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো তৈরি করতে সরকারকে নির্দেশ দেয় আদালত। ওইদিন-ই অব্যাহতি পান ১৩ কর্মকর্তা ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে। ২৭ আগস্ট ২০০৭, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বসার জায়গা নিয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয় আদালত। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয় সাময়িক ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি বিষয়ে জানানোর জন্য। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭, ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনী আইন বলবৎ/ কার্যকরের তারিখ নির্ধারণ করে দেয় সুপ্রীম কোর্টের ফুল কোর্ট।

১ নভেম্বর ২০০৭, বিচার বিভাগের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। ফুল কোর্টের ৭১ জন বিচারপতি (আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের) সর্বসম্মতভাবে মাসদার হোসেন মামলায় রায় তথা সংশোধনীযুক্ত ফৌজদারী কার্যবিধি আইন সমগ্র বাংলাদেশে ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর করার যে


www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন ওইদিন তা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হয়।

এ রায়ের ফলে ২২ অনুচ্ছেদ সংবিধানের "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" "The State shall ensure the separation of the judiciary from the executive organs of the State." বলবৎ করার রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা কার্যকর করা হল। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং প্রশাসনের দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা বন্ধ হল। ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাহী বিভাগের অধীনতা থেকে মুক্ত করা হল। পৃথকীকরণ বলবৎ করায় সাধারণ নাগরিকদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি বাস্তবায়িত করার যাত্রা শুরু হল।

প্রকৃতপক্ষে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৭ মে ১৯৯৭ এবং মহামান্য আপিল বিভাগ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯-এর রায়ের আলোকে অনতিবিলম্বে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পৃথক একটি সচিবালয় সুপ্রীম কোর্টের অধীনে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা অতি আবশ্যক।

কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হল, পৃথক বিচার বিভাগের ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা সাথে সাথেই বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রশাসন ক্যাডারের ক্ষমতা হারানোর বেদনা আর বিয়াম বিদ্রোহের জের হিসেবে মোবাইল কোর্টের অজুহাতে সর্বোচ্চ আদালতের রায় উপেক্ষা করে বিচারিক ক্ষমতা আবারো তারা করায়ত্ত করা শুরু করে। মোবাইল কোর্টের দন্ডের বিরুদ্ধে জেলা ও দায়রা জজ-এর আপীল শুনানি করার এখতিয়ার নেই। এই এখতিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের। এর ফলে ১ নভেম্বর ২০০৭-এর পৃথক বিচার বিভাগীয় যাত্রার পথ হল বন্ধুর, আর সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের দায়বদ্ধতা আবারও চেপে বসল জাতির স্কন্ধে। এ যেন 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'।

• লেখক : কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ এবং সাবেক মহাসচিব, বি.সি.এস. (বিচার) এসোসিয়েশন



www.pathagar.com

# আমার পিতা সিরাজুল হক

আনিসুল হক

আমার পিতা সিরাজুল হকের ছোটবেলা কেটেছে তাঁর পুলিশ কর্মকর্তা পিতার কর্মস্থল খুলনায়। ফরিদপুর জেলা হলেও গোপালগঞ্জ তখন খুলনার আওতাভুক্ত। মাঝখানে মধুমতি নামে একটি নদী। এপারে শেখ মুজিবুর রহমান ওপারে সিরাজুল হক। নদী সাঁতরে বা নৌকায় দু'জনই এপার-ওপার করে পরস্পরের গভীর সান্নিধ্যে এলেন। দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিরতির পর কলকাতায় আবার দেখা দুই বন্ধুর। একজন ইসলামিয়া কলেজে, অন্যজন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। তবে থাকতেন এক সঙ্গে বেকার হোস্টেলে।

সিরাজুল হক পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। শেখ মুজিব (তখনো বঙ্গবন্ধু হননি) শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। দেশ ভাগ হলো। শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে জেল জুলুম খেটে রাজনীতির চূড়ায় উঠছেন অন্য বন্ধু সিরাজুল হক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চপদস্থ কাস্টমস অফিসার। তবে, স্বাধীনচেতা সিরাজুল হক সরকারি চাকরিতে মানিয়ে নিতে পারলেন না। আইন পাস করে ওকালতি পেশায় যোগ দিলেন। দু'জন দুই মেরুতে থাকলেও তাদের যোগাযোগ বা বন্ধুত্ব সব সময়ই অটুট ছিল। ১৯৫৮ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যত মামলা হয়েছে, তার বেশিরভাগেরই আইনজীবী ছিলেন সিরাজুল হক। আইন পেশায় আসার পর গড়ে উঠল একটি রাজনৈতিক বন্ধন। সেই বন্ধুত্বের মায়ায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি পক্ষে যোগ দিলেন অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক। মামলার শুনানির সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকার কারণেই বোধহয় পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়লেন। সত্তরে আর তিয়াত্তরে আওয়ামী লীগের সাংসদ হলেন।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হওয়ার পর কারামুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব


www.pathagar.com

লাহোরে ছয় দফা ঘোষণা করে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঢাকা ফিরেন। তিনি প্রথমেই মোহাম্মদপুরে আব্বার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু গেলেন সাংবাদিক এবিএম মূসার বাসায়, তার সদ্যজাত ছেলেকে দেখতে। আমি বঙ্গবন্ধুকে এবিএম মূসার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মনে আছে, আব্বা ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিল তুই তুই সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আব্বা বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। তিনি কোনোভাবেই এই হত্যাকাণ্ডকে মানতে পারছিলেন না। তাই সুযোগ খুঁজছিলেন এর প্রতিবাদ করার। ১৯৭৫ সালে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ বঙ্গভবনে এমপিদের বৈঠক ডাকেন। ৭৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে সিরাজুল হক বলেছিলেন, যেহেতু আপনি বৈধভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হননি, সেহেতু আমার বক্তৃতায় আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্বোধন করতে পারছি না। মোশতাক ভাই হিসেবে সম্বোধন করতে চাই। কোন আইনের বলে আপনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তাও জানিনে। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তাদের সাথে আপনি বঙ্গভবনে আশ্রয় নিয়েছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিতে। আপনি যদি রাষ্ট্রপতি থাকতে চান, তাহলে বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হয়েছে তা আমাদের জানতে হবে। আইনানুযায়ী আপনাকে বৈধ রাষ্ট্রপতি বলা যায় না। বলা যায়, এই বৈঠকের পর মোশতাক প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন। চিন্তা করি, সেই সময় তার কতটা সাহস থাকলে মোশতাকের মুখের ওপর এসব কথা তিনি বলতে পারেন। ১৯৮৩ সালে আব্বা বলেছিলেন, সব হত্যার বিচার হয়, কিন্তু গোপালগঞ্জের শেখ লুৎফর রহমানের ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার হয় না।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আব্বাকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। ফৌজদারি মাসলায় আব্বার অবস্থান বিবেচনা করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য আব্বার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। সম্ভবত, প্রধানমন্ত্রী জানতেন, সব ভয় ভীতি, লোভ লালসা উপেক্ষা করে আব্বা তার বন্ধুর হত্যার বিচার কাজ পরিচালনা করতে পারবেন।

১৯৯৬ সালের ১৩ আগস্ট বিশেষ ক্ষমতা আইনে আসামি সৈয়দ ফারুক রহমানসহ তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ১ মার্চ মামলা ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানো হয়। ৩ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে বিশেষ এজলাস গঠন করা হয়। ওই বছরের ৭ এপ্রিল ২০ আসামির


www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়। এরই মধ্যে আব্বাকে রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ পিপি নিয়োগ করা হয়। নূরুল ইসলাম সুজন (বর্তমানে এমপি), মোশাররফ হোসেন কাজল, তৌফিকা করিম ও আমি বিশেষ সহযোগী পিপি হিসেবে নিয়োগ পাই। পরবর্তীতে রমজান আলী খান, সৈয়দ রেজাউর রহমান, সাহারা খাতুন (বর্তমানে মন্ত্রী), কামরুল ইসলাম (বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী) নিয়োগ পান। ১৯৯৭ সালের ৬ জুলাই রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দি নেয়া ও জেরা শুরু হয়। পরবর্তীতে জেল হত্যা মামলার দায়িত্বও আব্বাকে নিতে হয়েছে।

এটি ঠিক, ফৌজদারি আইনজীবী হিসেবে আব্বা সে সময় খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। এই দুটি মামলার দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি প্রাইভেট মামলা পরিচালনা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তার সব ধ্যান জ্ঞান ছিল, এ দুটি মামলা পরিচালনায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তার মধ্যে কোনো দুঃখবোধ ছিল না। বরং জীবনের শেষপ্রান্তে বন্ধুর হত্যা মামলা পরিচালনার সুযোগ পেয়ে তিনি গর্বিত হয়েছিলেন। আমার মা জাহানারা হকও আব্বাকে এসব বিষয়ে বেশ সহযোগিতা করতেন।

বঙ্গবন্ধুর বন্ধু হওয়ায় এ মামলা পরিচালনায় আব্বার নিরপেক্ষতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তুলেছিল আসামি পক্ষ। পরে আদালত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ে বলেছিলেন, 'জনাব সিরাজুল হক এই মামলার প্রধান আইনজীবী হইলেও মামলা চলাকালে কখনও তাহার আচরণ/কথাবার্তায় কোন পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টা আদালতের গোচরীভূত হয় নাই। এমনকি কোন আসামী পক্ষেরও এই জাতীয় আপত্তি উপস্থাপন করা হয় নাই বরং আসামী পক্ষ এবং তাহাদের পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি উদার সমর্থন জানাইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত মামলাটিতে সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে তাহার ভূমিকা পালন করিয়াছেন বলিয়া আদালত মনে করে। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগটি নাকচ করা হইল।'

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পরিচালনার সময় দেখেছি, আবেগের উর্ধ্বে উঠে পেশাদারী মনোভাব নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে খুনীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের জন্য তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার দায়রা ও জেলা জজ কাজী গোলাম রসুল ফায়ারিং স্কোয়াডে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দেন। রায়ের দিন আব্বার চোখে পানি দেখেছি। তিনি বলেছিলেন, 'এ রায়ে অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের আইনের শাসনের দিকে ফিরে আসার সুযোগ হলো।'


www.pathagar.com

একই বছরের ১১ নভেম্বর হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্সের জন্য মামলা পাঠানো হয়। ২০০০ সালের ৩০ মার্চ ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের আপিল শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়। ওই বছরের ১০ এপ্রিল এক বিচারপতি শুনানিতে বিব্রতবোধ করেন। ২৪ এপ্রিল হাইকোর্টের অপর একটি দ্বৈত বেঞ্চও বিব্রতবোধ করেন। ২০০০ সালের ২৮ জুন বিচারপতি মো. রুহুল আমিন ও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর শুনানি শুরু হয়। ২০০০ সালের ২২ অক্টোবর আব্বা যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন। মামলার এজাহার পাঠ করা অবস্থায় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আদালতের অনুরোধে আব্বা বিশ্রাম নিতে বসলে আমি এজাহার পাঠ শুরু করি। ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক শেষ হয়।

একই বছরের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিভক্ত রায় দেয়। সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই আমরা ১০নং আদালত কক্ষে প্রবেশ করি। আমাদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে দুইজন বিচারক আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে সিনিয়র বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন পনের জনের মধ্যে দশজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। বেঞ্চের কনিষ্ঠ বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। রায়ের পর আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। এ ধরনের রায়ের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এ রায়ে বিভিন্ন মহল থেকে কড়া সমালোচনা করা হলেও আব্বা কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলেন নি। তবে, তার মনের মধ্যে রাগ ও ক্ষোভ ছিল। তিনি জানতেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ফাঁসির রায় কার্যকর করতে হলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই করতে হবে।

২০০১ সালের ১৩ জানুয়ারি দুই বিচারপতির বিভক্ত রায় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান বিচারপতি ফজলুল করিমকে তৃতীয় বেঞ্চের বিচারক নিয়োগ করেন। ১৯ মার্চ আব্বা তৃতীয় বিচারপতির বেঞ্চে শুনানিতে বলেন, আসামিদের সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানেই শুনানি করতে গিয়ে আব্বা এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ৩০ এপ্রিল বিচারপতি ফজলুল করিম ১২ জনের ফাঁসির রায় আসামির সাজা বহাল রেখে, খালাস দেন তিন আসামিকে।

২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মামলাটির শুনানি আপিল বিভাগের কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। একই বছরের ২৭ শে মার্চে আব্বা শুনানি শুরুর আবেদন জানিয়েছিলেন। তখন বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন ও বিচারপতি আবু সাঈদ আহাম্মদ বিব্রত বোধ করায়


www.pathagar.com

শুনানি স্থগিত করা হয়েছিল। আব্বা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মামলাটি শেষ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। আর ১৫ ডিসেম্বর এ মামলায় আমাদের অব্যাহতি দেয় চার দলীয় জোট সরকার।

অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এ মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব মহাজোট সরকার আমাকে দেয়। ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর আপিলের রায়ের পর ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি আসামিদের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ওইদিন মধ্য রাতেই বঙ্গবন্ধুর ৫ খুনীর ফাঁসি কার্যকর হয়।

রায়ের পর আমি বলেছিলাম, এই রায়ে জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ব্যথা প্রশমন হয়েছে। শেষ হয়েছে লজ্জা, গ্লানি ও অপমানের অধ্যায়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে একটা বিরাট পদক্ষেপ এ রায় কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে তা সূচিত হয়েছে। আমার মনে কিছু ব্যথাও রয়েছে। সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যেমন স্বজন হারানোর ব্যথা রয়েছে, তেমনি আমার পিতা (প্রয়াত অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক) তার বন্ধুর (বঙ্গবন্ধু) নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর হওয়ার বিচার দেখে যেতে পারেননি।

বিশ্বাস করুন, আপিলের রায়ের পর আমি আমার পাশে আব্বাকে খুঁজছিলাম। আব্বা বেঁচে থাকলে যে কি খুশী হতেন, তা বলে বোঝানো যাবে না। তার কষ্ট লাঘবের গুরুভার আমার ওপরে ছিল। আমি চেষ্টা করেছি সেই দায়িত্ব পালনে। এখন আমার ওপর জেল হত্যা মামলা শেষ করার দায়িত্ব। আমি এটিও সফলতার সঙ্গে শেষ করে আব্বাকে চির শান্তি দিতে চাই। আমার মা জাহানারা হকও এই বিচার শেষ হওয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার মাকেও আমি শান্তি দিতে চাই। আব্বার রাজনৈতিক সহযোগী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানের হত্যার ন্যায় বিচার হলে তাদের পরিবারের পাশাপাশি পুরো জাতিও শান্তি পাবে। আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে বদ্ধপরিকর। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।


- লেখক : সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যা মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি

অনুলিখন: মাশহুদুল হক, বিশেষ প্রতিনিধি, এটিএন নিউজ




www.pathagar.com

# খসড়া সংবিধানের পাঠ

## মিজানুর রহমান খান

আমাদের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন ৩৪ জন। কয়েক বছর আগেও জানতাম যে, তাঁদের মধ্যে নয়জন বেঁচে আছেন। এর মধ্যে ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গণমাধ্যমে বেশ পরিচিত নাম। অন্যরা হলেন দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম, রংপুরের নীলফামারির আবদুর রউফ, কুমিল্লার দেওয়ান আবুল আব্বাছ, পটুয়াখালীর ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, গাইবান্ধার মো. লুৎফর রহমান ও অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মুনতাকীম চৌধুরী। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ড. কামাল হোসেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলো ইংরেজিতে লিখেছিলেন। তখন পেশাদার ড্রাফটসম্যানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ ব্যাপারে কমনওয়েলথ সচিবালয়কে অনুরোধ করা হলে তাঁরা সাড়া দেন। তাঁরা গাথরি (Guthrie) নামের একজন চৌকস ড্রাফটসম্যানকে পাঠান। ড. আনিসুজ্জামান স্মরণে এনেছেন গাথরি শব্দের আগে সম্ভবত জন কথাটি ছিল। তিনি ঢাকায় মাস পাঁচেক ছিলেন। তাঁকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমাদের সংবিধানের ইংরেজি ভাষ্যটিতে গাথরি যে অবদান রাখেন তা আজ আমরা স্মরণ করি। তিনি বেঁচে আছেন কি না বা বেঁচে থাকলেও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারিনি। একবার একজন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে কমনওয়েলথ সচিবালয়ে যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁরা তাৎক্ষণিক তাঁর হদিস দিতে পারেননি। আমাদের দেশে বেসরকারি বিলের তেমন মূল্য নেই। কিন্তু হাউস অব কমন্সে উল্লেখযোগ্য বিল বেসরকারি হিসেবে আসে। এবং তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। সে অনুযায়ী আইনও হয়। জন গাথরি এ


www.pathagar.com

ধরনের বেসরকারি বিল তৈরির কাজে নিয়োজিত একটি ল' ফার্মে কাজ করতেন।

আমাদের সংবিধান তৈরির ক্ষেত্রে কোন কোন দেশের সংবিধান বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার কাজ বাকি রয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িতে স্যার আইভর জেনিংসের 'কন্সটিটিউশনাল প্রবলেমস ইন পাকিস্তান' বইটি ছিল। তিনি নিজে বলেছেন, ওই বইটি তিনি পাকিস্তানের কারাগারে থাকাকালে বারংবার পড়েছেন। আমারও মনে হয় বাংলাদেশ সংবিধানকে বুঝতে হলে আগে ১৯৫৬-র সংবিধান ধরে আসতে হবে। ১৯৬৯-'৭১ সালে আওয়ামী লীগ সংবিধানের তিনটি খসড়া তৈরি করেছিল। এসব খসড়াগুলোর সঙ্গে বাহাত্তরের সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলোর মিল-অমিল খতিয়ে দেখা দরকার।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কাছ থেকে জেনেছি সংবিধানের স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের গোড়ার কথা। বাহাত্তরের খসড়া সংবিধানে ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ ছিল না। ব্যারিস্টার আমীর-উল প্রস্তাব করলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, বিশ্বের আর কোনো দেশে লিখিত সংবিধানে স্থানীয় সরকার নিয়ে আলাদা কোনো অনুচ্ছেদ দেখা যায় না। কিন্তু ড. কামাল হোসেন তাঁকে বললেন তাঁর প্রস্তাব লিখিতভাবে দিতে। তিনি ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে এ কথাটি যুক্ত করলেন, 'প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' এই সংযোজন একটি অসাধারণ উদ্ভাবন।

কিন্তু পরিহাস হচ্ছে, চতুর্থ সংশোধনী পাসের পর ড. কামাল হোসেনই তাঁকে জানালেন, আপনার স্থানীয় সরকার তো ভিকটিম হলো। এ দুটো অনুচ্ছেদ চতুর্থ সংশোধনীতে বিলুপ্ত হওয়ার পর তা ফিরে এল দ্বাদশ সংশোধনীতে দীর্ঘ ১৬ বছর পর। কুদরত-ই-ইলাহি বনাম রাষ্ট্র মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অনধিক ছয় মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সব স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার নির্দেশনা দেন, যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া দেশটি স্থানীয় শাসন প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। কারণ ঢাকার বাইরে মফস্বলে তারা স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজি নয়।


www.pathagar.com

ড. আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আলাপে মনে হয়েছে, সংবিধানের বাংলা তরজমার অধিকাংশ কাজ তাঁরই। এ কাজে তাঁকে জাতীয় সংসদের বিতর্ক বিভাগের তৎকালীন সহ-সম্পাদক নেয়ামাল বাসির ও সংসদের অপর একজন কর্মী–যার নাম তিনি মনে করতে পারেননি–তাঁরা তাঁকে সহায়তা করেন।

বাংলা তরজমার যথার্থতা নিয়ে তাঁর মনে বড় কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, প্রথম অনুচ্ছেদে ইউনিটারি স্টেটের বাংলা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র নয়, তাই কেন্দ্রীয় শব্দটার আমেজ তিনি রাখতে চাননি। কিন্তু ইউনিট অর্থ একক। তাই 'ইউনিটারি'র বাংলা 'একক' করা যথার্থ হয়নি বলে তিনি মনে করেন। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, বাংলা পাঠের সঙ্গে ইংরেজি পাঠের সামঞ্জস্য না থাকার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে দুটি মামলা হয়েছিল। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মযহারুল ইসলাম ও ড. আনিসুজ্জামানকে সদস্য করে শেষ পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক কমিটি করা হয়। এ কমিটি মাত্র দুটি বৈঠক করেছিল। এ বৈঠকে ড. আনিসুজ্জামানের তরজমার অনুমোদন হয়। এদের মধ্যে ড. আনিসুজ্জামান বাদে অন্যরা এখন প্রয়াত।

বাহাত্তরের মূল সংবিধানের যদি একটি গলদ চিহ্নিত করতে বলা হয় তাহলে ৫৫[২] অনুচ্ছেদের কথাই বলব। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে তাকিয়েই কেবল প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল, সেই সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল। প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ প্রকাশিত খসড়া সংবিধান থেকে একটি বিধান অবিকল তুলে দিচ্ছি, যাতে এ ব্যাপারে সংবিধান প্রণেতাদের মনোভঙ্গি মূর্ত হয়ে ওঠে। ৬০[৩] অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল:

'The functions of the Cabinet shall be to advise the Prime Minister in matters affecting the Government of Bangladesh...'[পৃ.২১]

বিশ্বের অন্য কোনো সংসদীয় গণতন্ত্র অনুসরণকারী দেশের লিখিত সংবিধানে এই অবস্থাটি অন্তত আমার চোখে পড়েনি। রাষ্ট্রপতি কিংবা


www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী নামের আড়ালে বাংলাদেশে এক ব্যক্তির হাতেই সব সময় নির্বাহী ক্ষমতা থেকেছে। এর সঙ্গে ৭০ অনুচ্ছেদ এবং ব্যক্তির খেয়ালখুশির দলীয় গঠনতন্ত্র কার্যত সংসদীয় গণতন্ত্রকে আঁতুড়ঘরেই রেখে দিয়েছে।

এটা তাহলে কোথা থেকে এসেছে?

ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান থেকে। যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুজিব আজীবন লড়াই করেছেন। নির্দিষ্টভাবে বলেছেন, তিনি সংবিধানে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটাবেন। তিনি তা পারেননি। তাঁর হাতেই কি করে সব ক্ষমতা রাখা যায় তার সব চেষ্টাই বাহাত্তরের খসড়া সংবিধানে চোখে পড়ে। চূড়ান্ত দলিলও তাকে নিঃস্ব করেনি। কিন্তু তারপরেও তাঁকে বাকশাল করে ক্ষমতাকে আরো নিরঙ্কুশ করতে হয়েছে। এজন্য আমরা তাঁর সমালোচনা করি। অথচ তাঁর চেয়েও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন চাপিয়েছেন জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ। দুই নেত্রী প্রত্যেকের অশৌচ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছেন। পঞ্চদশ সংশোধনীতে তা আরো বিকৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান নিয়ে অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ সাংবিধানিক বিশেজ্ঞদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ কে সি হুইয়ারেও উপস্থিত ছিলেন। ড. কামাল হোসেন বলেন, তাঁরা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে আপত্তি তোলেন। তিনি এখন জোর দিয়েই বলেন, এর সংশোধনী দরকার। ড. আনিসুজ্জামানও বললেন, ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে গাথরিও আপত্তি তুলেছিলেন। মজার বিষয় হলো, ১১ সেপ্টেম্বরের খসড়া সংবিধানে কিন্তু কেবল পদত্যাগ ও দল থেকে বহিষ্কারের কারণে সদস্যপদ শূন্য হওয়ার বিধান করা হয়েছিল। নিচের ৭০ [১] অনুচ্ছেদটি তারই প্রমাণ বহন করেঃ 'If a person elected as a member of Parliament at an election at which he was nominated as a candidate by a political party, either resigns from, or is expelled by, that party, he shall vacate his seat..'

গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজন সদস্য সংবিধান অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। ইতিপূর্বে তিনি এই লেখককে বলেন, 'যেহেতু সেই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সে কারণে সংবিধানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলনীতি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলোই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই ভাগে


www.pathagar.com

বর্ণিত নীতি আইনানুগভাবে কার্যকর করার উপায় ছিল না। তাই আমি যুক্তি দিলাম, অন্তত একটি ক্ষেত্রে এটা কার্যকর করা হোক। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক। আমি লিখিত নোট দিলাম, যতক্ষণ না এ বিধানটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ততক্ষণ আমি সংবিধানে সই করা থেকে বিরত থাকব।'

আজ এই সংবিধান বার্ষিকীতে গণতন্ত্রের ধারা আরো বেগবান হওয়ার জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে গাইতে বাংলাদেশ সংবিধানের যথা সংশোধনীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংস্কার কমিটি বা কমিশন গঠনের দাবি জানাই।

• লেখক : যুগ্ম সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো



www.pathagar.com

# সৈয়দ ইশতিয়াক ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান

মোঃ আসাদুজ্জামান

১৯৯৮ সালের পহেলা জুন সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ব্যারিস্টার-এট-ল-এর সাথে তাঁর জুনিয়র হিসেবে যোগদান করি। তৎপূর্বে ১৯৯৪ সালের পহেলা এপ্রিল থেকে জনাব নিজামুল হক নাসিম, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর সাথে আইন পেশায় আমার হাতেখড়ি। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের সাথে আমার যোগদান ছিল সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। কারণ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আইনজীবী আদিলুর রহমান খান দুই মাসের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটিতে লন্ডনে তাঁর স্ত্রীর পাশে থাকবেন বলে আমাকে তাঁর বিকল্প হিসেবে ওই সময়ের জন্য জনাব ইশতিয়াক আহমেদকে অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী, আমি তাঁর নিরন্তর অনুসারী, তিনি আমার অগ্রজসম, যাকে আমি অনুসরণ করি সম্পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস দিয়ে। তাই তাঁর কথাতে আমাকে উক্ত সময়ের জন্য সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর সাথে যোগদান করার মতো সুবর্ণ সুযোগ হয়। ফলে, আমার প্রত্যাশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল দুই মাস সময় কেন্দ্রিক। আমি যোগদান করার পর প্রথম দিনেই সংক্ষিপ্ত নির্দেশনায় সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ আমার কাছে জানতে চাইলেন, "বাবা, বাসায় কে কে থাকে, কোথায় বাসা, কখন বাসায় ফিরতে হয়?" আমি সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর তিনি জানিয়ে দিলেন, প্রতিদিন চেম্বারে তাঁর সাথে লাঞ্চ করতে হবে। এরপর আমি তাঁর নির্দেশনা মতোই সকালে কোর্টে যাই, তাঁর সাথে ওয়ালসো টাওয়ারের চেম্বারে ফিরি, একসাথে লাঞ্চ করি, চেম্বারে বসে কাজ করি ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজের ফাঁকে পাশের রুম থেকে তাঁর ডাক আসতো। সামনে গেলে বলতেন, বাবা, কাগজ কলম নিয়ে বস। এর পর চলতো কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো



www.pathagar.com

দীর্ঘমেয়াদী ডিকটেশন। প্রথম দিকে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে আমি প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্য আড্ডা দিতে যেতাম, যখন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বিশ্রাম নিতেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "বাবা, তুমি কোথায় যাও?" আমি উত্তর দেয়ার পর তিনি মৃদু হেসে জানালেন, কাজের চাপে সব আড্ডা শেষ হয়ে যাবে। পেশায় মনোনিবেশ কর, এটাকে উপভোগ কর। এরপর আমি আড্ডা কমিয়েছি, পেশায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছি। তবে, উপভোগ করি কিনা সেটা এখনো বলতে পারব না। এভাবেই দুই মাস সময় পার হওয়ার কয়েক দিন আগে লাঞ্চ শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, বাবা একটু রুমে আস, কথা আছে। আমি গেলাম। তিনি প্রথমে জানতে চাইলেন, চেম্বারে তাঁর সাথে কাজ করতে আমার কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা। আমি জানালাম কোন অসুবিধা হয়নি। তখন তিনি বললেন, "বাবা, আমি যদি তোমাকে না ছাড়ি তোমার কোন আপত্তি আছে?" আমি শুধু বলেছিলাম, এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। তবে, আমি 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' নামে একটি মানবাধিকার সংগঠনে এবং জনাব নিজামুল হক নাসিম সাহেবের সাথে কাজ করি। তাদেরকে আমার বলে আসতে হবে। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমার উত্তরে, বিশেষ করে আমার দায়িত্ববোধের প্রকাশ দেখে, খুশি হয়েছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, প্রয়োজনবোধে তিনি ব্যারিস্টার সালমা সোবহান এবং নিজামুল হক নাসিম সাহেবকে বলবেন। আমি বলেছিলাম, আমি চেষ্টা করে দেখি। তার পর আমি নিজেই উনাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ নামের এক বিশাল হৃদয়ের মানুষের সাথে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করার এবং সংস্পর্শে থাকার সুযোগ পেয়েছি। ২০০৩ সালের ১২ জুলাই সন্ধ্যায় ঢাকা বারডেম হাসপাতালে যে মুহূর্তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই মুহূর্তে মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে তাঁর মৃত্যু আমি দেখেছি। কিভাবে একজন জীবন্ত মানুষ মৃতে পরিণত হয় তা প্রত্যক্ষভাবে আমার প্রথম এবং এখন পর্যন্ত শেষ দেখা। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ-এর পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, দৃঢ়তা নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করার মতো কোন ভাষা কিংবা ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁর বাচনভঙ্গি, তাঁর আর্ট অব সাবমিশন,তাঁর নিখুঁত আইনের ব্যাখ্যা ছিল অনবদ্য, অভিভূত করার মতো। প্রতিটি মামলার প্রতিটি ঘটনা এবং আইনগত দিক রপ্ত করে তার পরই তিনি আদালতের সামনে দাঁড়াতেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় তাঁর সাথে কাজ করেছি; কিন্তু একটি মামলাতেও আমি


www.pathagar.com

দেখিনি যে, তিনি নিজে না পড়ে আদালতের সামনে দাঁড়িয়েছেন। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ একজন বিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে আদালতের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যা সর্বজনবিদিত। তিনি কখনো আদালতকে অসম্মান করেননি কিংবা কটূক্তি করেননি। আদালতের অনেক আচরণে কষ্ট পেয়ে সুবোধ বালকের মত মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছেন। তাঁর বন্ধু বাৎসল্যতা, শান্ত, সৌম্য, ভদ্র, রসাত্ববোধ এবং সুমিষ্ট আচরণ ছিল উপভোগ্য। তাঁর বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি আইনজীবীদের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সিভিল সোসাইটির সদস্য, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহলেও পরিব্যাপ্ত ছিল। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ শুধু একজন ব্যক্তি, একজন পিতা, একজন স্বামী কিংবা একজন সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন তা আমার কখনো মনে হয়নি, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর উপস্থিতি যে কোন পরিবেশে, যে কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে অভিভাবকের ভূমিকায় বসিয়ে দিতো। এর জন্য কখনো তাঁকে কারো সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অপকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়নি। এটাই ছিল সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের অর্জন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ।

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং গণতন্ত্র সংরক্ষণের নিরন্তর সংগ্রামে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এরশাদ বিরোধী সংগ্রামে গণতন্ত্রের জন্য তিনি কারাবরণ করেছেন, কোন আপোষ করেননি। দেশ যখন ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক স্বৈরাচার মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে উত্তরণের পথে সাংবিধানিক সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ তখন আইনজীবী সমাজের পুরোধা হিসেবে, সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকারের সাংবিধানিক রূপ দিতে নিরন্তর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, আইনের শাসন ও গণতন্ত্র ছাড়া বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে না এবং এ দুটির অবর্তমানে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হবে, যা বর্তমান সময়ে অনেকেই অনুধাবন করছেন। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ মনে করতেন অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক এবং এই ব্যবস্থা নির্বাচিত তথা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য একটি কার্যকর সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যা বিশ্বের যে কোন গণতান্ত্রিক সংকট উত্তরণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে।

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে আমি দেখেছি অনেক কাছে থেকে। পাঁচ বছর সময় খুব দীর্ঘ না হলেও কর্ম দিবসের প্রতিটি দিন তাঁর সাথে চলাফেরা এবং


www.pathagar.com

উঠাবসা করে তাঁকে চিনতে কখনো ভুল হওয়ার কথা নয়। তাঁর সাহচর্য ছিল হৃদয়স্পর্শী, মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে জানার মধ্যে আমি নিজেকে শোধরাতে পেরেছি। আমার জানা মতে, তিনি সব সময় সত্য ও সঠিক কথা বলতেন, আইন পেশায় সততার কোনো বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে দেখিনি। তাঁর যেটা পছন্দ হয়নি সেটা হয়তো মুখে বলে ফেলেছেন অথবা চুপ করে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যের মতকে কখনো অসম্মান করতে আমি দেখিনি। তিনি বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল ছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'দুবার উপদেষ্টা ছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, বার কাউন্সিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এই দায়িত্ব পালন সর্ব মহলে সমাদৃত ছিল। তিনি নির্মোহ মানুষ ছিলেন।

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর সাথে কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। তাঁর অনবদ্য স্নেহ, নিত্যদিনের আদর, পিতৃতুল্য ভালবাসা আর অভিভাবকসম পথ প্রদর্শন আমি কখনো ভুলব না। আজ তাঁর সম্পর্কে লিখতে যেয়ে শুধু মনে হয় অবধারিত সত্য মৃত্যু কেন এতো নিষ্ঠুর হয়? জীবন যেখানে দ্রোহ আর ভালোবাসার প্রতিশব্দ মৃত্যুই কি সেখানে শেষ কথা? সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর বর্ণিল কর্মময় জীবন হয়তো বলবে, মৃত্যু সত্য; কিন্তু যে জীবন দ্রোহ আর ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি সেই জীবনের মৃত্যু নেই, কর্মের মধ্য দিয়ে সেই জীবন বেঁচে থাকে, অবিনাশী হয়ে থাকে তাঁর কর্মচ্ছটা।

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর সাথে আমি কাজ করার পাঁচ বছর সময়ের কয়েকটি ছোট ঘটনার বিবরণ দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না, যা আমি প্রায় প্রতিদিন মনে করি। ১৯৯৯ সালের কোন একদিন দুপুরের খাবার টেবিলে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব নূরুল ইসলাম সুজা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কার মতো ল'ইয়ার হতে চাও, তাহলে তোমার উত্তর কি হবে?' আমি সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর উপস্থিতিতে অবলীলায় কোন সাত পাঁচ না ভেবে বলেছিলাম, 'মাহমুদুল ইসলাম সাহেবের মতো।' তখন নূরুল ইসলাম সুজা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন তোমার সিনিয়র সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সাহেবের মতো হতে চাও না?' আমার আবার সেই সরল স্বীকারোক্তি, 'মাহমুদুল ইসলাম সাহেবের মতো আইনজীবী হওয়া যাবে; কিন্তু ইশতিয়াক সাহেবের মতো প্রতিষ্ঠান হতে পারব না। তাই এত বড় স্বপ্ন দেখি না।' সেদিন ইশতিয়াক সাহেব আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। ২০০১


www.pathagar.com

সালে আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর ওয়ালসো টাওয়ারের চেম্বারে এসে আমাদের সবার সাথে তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। খাবার টেবিলে সর্বজনাব ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। খাবার সময় আলোচনার বিষয় ছিল, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভাল কি মন্দ'। সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, এই ব্যবস্থায় ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন। আমি অবুঝের মতো বলেছিলাম, আমি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তখন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ জানতে চেয়েছিলেন, 'কেন?' আমার উত্তর ছিল এই ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে যেমন আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা একে অন্যকে অবিশ্বাস ও অনাস্থার জায়গা তৈরি করেছে, অন্যদিকে তেমনি এই ব্যবস্থা চালু হলে আমাদের বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ যিনি বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হচ্ছেন, তাঁর মনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার একটি সুপ্ত বাসনা কাজ করবে। তাঁর এই সুপ্ত বাসনাই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে সহায়তা এবং প্রশ্রয় দেবে যা বিচার বিভাগের জন্য অশনি সংকেত। এছাড়াও আমি বলেছিলাম, একটি অনির্বাচিত সরকার মাত্র তিন মাসের জন্য ক্ষমতায় এসে আর যাই করুক জনগণের পাল্‌স না বুঝে জনগণের ভাল কাজ উপহার দিতে পারবে না। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত না হলেও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমার মতামতকে অত্যন্ত শংকা এবং সতর্কতার সাথে সমর্থন করেছিলেন। তবু তিনি বলেছিলেন, বিচারাঙ্গনকে রক্ষা করতে হলে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে হবে। এগুলো একে অপরের পরিপূরক। আজ বলতে দ্বিধা নেই, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর সেই দিনের সেই কথার সাথে আমি আলোচনায় একমত না হতে পারলেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন, বিচার ব্যবস্থার দৈন্যতা এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-এর ব্যাপ্তি দেখে আজ মনে হচ্ছে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ কত দূরদর্শী ছিলেন। তাঁর সেই দিনের কথাগুলো শুধু নিরেট সত্যই নয়, আমাদের নিরন্তর সংগ্রামের অনবদ্য নির্দেশনাও বটে।

সর্বশেষ, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের শেষ কর্মদিবসের একটি ছোট্ট ঘটনা আমি উল্লেখ না করে পারছি না। কারণ, সেই দিনের সেই ঘটনা আমার সারা জীবনের একটি বেদনাশ্রু হয়ে আছে। দিন তারিখ আমার মনে নেই।


www.pathagar.com

চেম্বারে তার শেষ কর্মদিবসে রাত ৯ টার দিকে আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর রুমে। বসতে বললেন। খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, 'বাবা, কাল থেকে যদি আর চেম্বারে না আসি, চেম্বার কি সামাল দিতে পারবে?' তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'স্যার, এভাবে কেন বলছেন? শরীর কি খুব খারাপ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'দেখি, কয়দিন বাঁচি।' এরপর উনি চেয়ার ছেড়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কালকে আপীল্যাট ডিভিশনে কিছু আছে?' আমি বললাম, 'না'। ঐদিন রাত সাড়ে বারোটার দিকে ব্যারিস্টার নিহাদ কবির আমাকে ফোন করে জানালেন, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে আনকনসাস অবস্থায় গুলশানের শিকদার মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছুটে গেলাম গুলশানের ১০৪ নং রোডের সেই হাসপাতালের কেবিনে। তখন আমার মনের মধ্যে একটিই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, যা আজও ঘুরপাক খায়, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সাহেব কি জানতেন, এই দিনের পর আর কখনো তার প্রিয় কর্ম জীবনে তিনি ফিরে আসবেন না? এ ধরনের অগ্রিম বার্তা কি তার মতো মহৎ মানুষরা আগেই পেয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমার এ লেখা শেষ করছি। আর এটা লিখতে গিয়ে আজ আমার চোখ ভিজে যায় চোখের জলে। ঝাপসা চোখে আমি আমার সদ্য প্রয়াত প্রিয় বাবাকে খুঁজি, খুঁজি বাবার মত সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে। প্রত্যাশা করি, বাস্তবে নয়, স্বপ্নের সারথী হয়ে তিনি যেন ফিরে আসেন আমাদের বিপন্ন বাংলাদেশের ভ্যানগার্ড হয়ে।

• লেখক : সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক ছাত্রনেতা



www.pathagar.com

# সংবিধান নিয়ে বিতর্ক

সালেহউদ্দিন

দেশের সংবিধান নিয়ে সব সময়ই বিতর্ক চলছে। ১৯৭২ সালে ৪ নভেম্বর সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে এখন পর্যন্ত এ বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই দেশ স্বাধীনের পর এ সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৭৩ সালে দেশের প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যরাও ৭২ সালের সংবিধানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও সে সময় সংবিধানের কোনো বিধানকে অস্বীকার করার মতো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না বা গড়ে উঠেনি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানকে একটি উন্নত এবং অগ্রসরমান সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সংবিধানের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ '৭২ সালে প্রণীত সংবিধানকে একটি অগ্রসরমান সংবিধান হিসেবে অভিহিত করে বলেছিলেন, জাতি হিসেবে আমরা যতটুকু অগ্রসর '৭২-র সংবিধান তার চেয়েও বেশি অগ্রসর।

রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি ছাড়া ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান নিয়ে তেমন কোনো বিরোধ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে চার মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর বড় ধরনের বিতর্ক দেখা দেয়। একটি পক্ষ এই চার মূলনীতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বলে দাবি করেন। তারা মনে করেন মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে এই চার মূলনীতি সংবিধানের অংশ হয়েছে–বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ওই চার মূলনীতি বদলানো যাবে না। এ



www.pathagar.com

প্রসঙ্গে সম্প্রতি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ল' রিপোর্টার্স ফোরামের এক কর্মশালায় বলেছেন, গণঅভ্যুত্থান বা আরেকটি মুক্তি সংগ্রাম ছাড়া ১৯৭২ সালের চার মূলনীতি বদলানো সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদে ৩শ জন সংসদ সদস্য চাইলেও তা পারবেন না।

অন্য পক্ষ মনে করেন এই চার মূলনীতি জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই মূলনীতি গ্রহণের পক্ষে জনগণের কোনো ম্যান্ডেট নেয়া হয় নি। এমনকি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও এই চার মূলনীতি সম্পর্কে কোনো ধরনের ইঙ্গিতও ছিল না। বরং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তিনটি বিষয়কে রাষ্ট্রের আদর্শ ও দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। এই তিন দর্শনকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলে এ নিয়ে আজ কোনো বিতর্ক হতো না। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তার 'স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে আবারও সংবিধানের কথা লেখা'য় যথার্থই বলেছেন, 'সংবিধানে আদর্শিক কথা যত কম থাকে তত ভালো'। আদর্শিক কথা নিয়ে দেশে বিতর্ক-বিভক্তি কম হয়নি।

সেই বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই বিতর্ক এবং দলীয় রাজনীতির চেতনা, চিন্তা এবং দর্শন অনুযায়ী প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে পনেরোবার সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানের ওপর হাত পড়েছে সামরিক শাসকদেরও। তবে ১৯৭২ সালে ৪ নভেম্বর সংবিধান প্রণয়নের কয়েক মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণেতাদের হাতেই বড় ধরনের দুটি মৌলিক পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কালাকানুন প্রবর্তন ও মৌলিক অধিকার হরণ সংক্রান্ত সংশোধনী আনা হয়েছিল। এর আগে ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দির বিচারের জন্য সংবিধানের প্রথম সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো–অভিযুক্তরা যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশ নির্দেশের বিরুদ্ধে সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকার রক্ষার সুযোগ নিয়ে কোনো প্রতিকার প্রার্থনার আবেদন করতে পারবে না।


www.pathagar.com

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে পাস হয় সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী। নিবর্তনমূলক আটকের জন্যই মূলত এই সংশোধনী আনা হয়েছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে নিবর্তনমূলক বিশেষ বিধান সম্বলিত আইনে আটককৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রেহাই দেয়া হয়। এই সংশোধনীর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছিল বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে স্বাধীন দেশে প্রথম কালাকানুনের বিধান চালু করা হয়েছিল। এছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংশোধনী ছিল জরুরি অবস্থা জারি নিয়ে। মূল সংবিধানে জরুরি অবস্থা জারির কোনো বিধান ছিল না। দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধন আইন ১৯৭৩-এর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা জারির বিধান প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকবে।

১৯৭৪ সালে ২৮ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনা হয়। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি কার্যকর করার জন্য মূলত এই সংশোধনী আনা হয়েছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূ-সীমানায় অন্তর্ভুক্ত তালপট্টিকে ভারতের ভূ-সীমানায় অন্তর্ভুক্ত বেরুবাড়ি পাওয়ার বিনিময়ে ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারত আজ পর্যন্ত বেরুবাড়িকে হস্তান্তর করে নি।

সংবিধানের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এই সংশোধানী আনা হয়। এর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে চালু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। জাতীয় দল (বাকশাল) ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। জাতীয় দলের সদস্য না হলে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের আসনও শূন্য ঘোষণা করা হয়। এমনকি জাতীয় দলের সদস্য না হলে যে কেউ রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীও হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাদেরকেও জাতীয় দলের সদস্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। এই সংশোধনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল 'রাষ্ট্রপতি-সংক্রান্ত বিশেষ বিধান' সংযোজন। এই অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদে যিনি ছিলেন (মোহাম্মদ উল্লাহ) তার পদ শূন্য করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো নির্বাচন ছাড়াই রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক এখনো হচ্ছে। একপক্ষ


www.pathagar.com

দাবি করেন বঙ্গবন্ধু পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাকশাল কায়েম করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এটি ছিল একটা সাময়িক ব্যবস্থা। অন্যপক্ষ এটিকে দেখে গণতন্ত্র হত্যা এবং বাক স্বাধীনতা হরণ ও এক দলীয় শাসন হিসেবে।

সংবিধানে সামরিক শাসনের কালো হাত পড়ে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খন্দকার মুশতাক আহমদ দেশে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন। পরবর্তীতে ক্যু বা পাল্টা ক্যু ও কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দেশে এই প্রথম সংবিধান সংশোধন করা হয় সামরিক ফরমানের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত যাবতীয় সামরিক ফরমান বিধিমালা ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেয়া হয়। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয় সংবিধানের চার মূলনীতিতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগনিত করা হয়। এছাড়া সংযোজিত করা হয়-সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি কথাটি। অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র পরিচালনার এই মূলনীতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালে মূল সংবিধানে যে চার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল দেশ স্বাধীনের পর এ নিয়ে জনগণের কোনো মতামত বা গণভোটের যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়নি, তেমনি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তীতে মূলনীতির ব্যাপারেও জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া হয়নি। জনগণের নামে মূলনীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের চার মূলনীতিতে আবার ফেরত আসা হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের আশংকা জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যদি কখনো দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তাহলে চার মূলনীতিতে আবার পরিবর্তন আসবে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য হলো যখন যে দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তখন তার রাজনীতি ও দর্শন সংবিধানে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে বারবার রাষ্ট্র পরিচালনার


www.pathagar.com

মূলনীতিতে পরিবর্তন আসে। দলনিরপেক্ষ মানুষদের মতে, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে মূলনীতি নির্ধারণ করা উচিত।

সংবিধান সংশোধন হয় বৃহত্তর জনগণের কল্যাণের স্বার্থ বিবেচনা করে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে সংবিধান সংশোধনের ইতিহাসও রয়েছে। উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য ১৯৮১ সালের ১০ জুলাই সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী আনা হয়েছিল।

ষষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সাড়ে সাত মাসের মধ্যে দেশে আবার সামরিক শাসন জারি হয়। সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ সংবিধান স্থগিত এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে হটিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদের সামরিক শাসনের বৈধতা দেয়ার জন্য ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর সংবিধানে সপ্তম সংশোধনী আনা হয়। এর আগে সামরিক শাসনের অধীনে ১৯৮৬ সালের অনুষ্ঠিত হয় ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে এরশাদের সামরিক শাসনের সকল কৃতকর্মের বৈধতা দেয়া হয়। পঞ্চম সংশোধনী ও সপ্তম সংশোধনীর মধ্যে তফাত হলো, এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে তিনবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের ৯ জুন ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদে পাস হয় সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী। এর আগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল তৃতীয় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে ১ বছর ৪ মাস ২৬ দিনের মাথায় এরশাদ সংসদ ভেঙে দিয়ে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত ওই সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ দেশে প্রতিষ্ঠিত কোন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি। জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া গঠিত ওই সংসদে এরশাদ রাষ্ট্রের দর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনেন। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজিত হয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এছাড়া এরশাদ সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে রাজধানীর বাইরে হাইকোর্টের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সুযোগ করে দেন। এর বিরুদ্ধে প্রধানত


www.pathagar.com

রাজধানী কেন্দ্রিক আইন পেশায় নিয়োজিত আইনজীবীরা সোচ্চার হয়ে উঠেন। আইনজীবীদের আন্দোলন ও বর্জনের মুখে সুপ্রিমকোর্টে সে সময় অচল অবস্থা দেখা দিয়েছিল। অষ্টম সংশোধনীর ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। পরে সুপ্রিমকোর্ট রাজধানীর বাইরে ছয়টি স্থানে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনকে সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বৈধতা চ্যালেঞ্জ না করায় এটি বহাল থাকে।

সুচতুর এরশাদ আন্দোলকে বিভ্রান্ত করার জন্য মূলত সংবিধানের নবম সংশোধনী এনে ছিলেন। ওই সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রপতির মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া। সংবিধানের ৫১ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে তাতে বলা হয়, একাদিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। এই সংশোধনের মাধ্যমে এরশাদ দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি পরিবর্তী মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে আর ক্ষমতায় থাকবেন না। এছাড়া এই সংশোধনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা। ১৯৯০ সালের ২৩ জুন সংবিধানের দশম সংশোধনী পাস হয়। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলাদের আসন ১৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করা হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট জাতীয় সংসদে পাস হয় সংবিধান একাদশ সংশোধন আইন। এর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকালের বৈধতা এবং প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের কোনো বিধানের সংশোধন করা হয় নি। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর দেশব্যাপী গণআন্দোলনের মুখে সেনাশাসক জেনারেল এরশাদের পতন হয়। দেশের এই ক্রান্তিকালে তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল এবং ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবী সংগঠনের আহ্বানে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় তিন জোটের পক্ষ থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের কাছে অঙ্গীকার করা হয়েছে, নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধান বিচারপতি পদে তাকে ফেরত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয় পার্টি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে ক্রান্তিকালীন বিধান


www.pathagar.com

হিসেবে এটি সংবিধানে সংযোজন করেন। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২১ প্যারায় ক্রান্তিকালীন বিধান হিসেবে একাদশ সংবিধান সংশোধন আইন সংযোজনকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অবৈধ ঘোষণা। পঞ্চম সংশোধনীর মূল রায়ে এটি বৈধতা পেলেও রিভিউ পিটিশনে আপিল বিভাগ সেটি অবৈধ ঘোষিত হয়। দেশের এক ক্রান্তিকালে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, অবৈধ ঘোষণার রায়ের মাধ্যমে মূলত তাকেই অস্বীকার করা হয় । একই অবস্থা হয়েছে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে। আপিল বিভাগ ক্রান্তিকালীন বিধান হিসেবে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২২ প্যারায় এই সংযোজনকে অবৈধ ঘোষণা করে। এ সংক্রান্ত রিভিউ পিটিশনের রায়ে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে সংবিধান প্রণয়ন-পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা হবে। এর বাইরে ক্রান্তিকাল হিসেবে সংবিধানে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা সঠিক হয়নি। আপিল বিভাগের এ রায়ের পর ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর পঞ্চদশ সংশোধনীর পর সর্বশেষ মুদ্রিত সংবিধান থেকে এগুলো ফেলে দেয়া হয়েছে। ফলে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী এখন আর সংবিধানের অংশ নয়। প্রসঙ্গত ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দ্বাদশ সংশোধনী পাস হয়। একাদশ সংশোধনীর মতোই দ্বাদশ সংশোধনী পাসে সংসদে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হয়। সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সদস্যরা এক আনন্দঘন পরিবেশের মাধ্যমে দ্বাদশ সংশোধনী বিলে ভোট দেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন করে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে আসে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে আমাদের সরকার পদ্ধতি ছিল সংসদীয় পদ্ধতির। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে এই পদ্ধতির অবসান ঘটে। জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদের পুরো শাসনকাল ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির। দ্বাদশ সংশোধনীর পর বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। এর আগে তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের বিলোপ করা হয়।

১৯৯৬ সালে ২৮ মার্চ আরেকটি ভোটারবিহীন সংসদে তত্ত্বাধায়ক সরকার খ্যাত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন পাস হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মূলত সুশীল সমাজের নেতৃত্বাধীন একটি নির্দলীয় সরকার। এই সরকারের


www.pathagar.com

অধীনে দেশে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটিতে আওয়ামী লীগ ও একটিতে বিএনপি বিজয়ী হয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে গঠিত হলেও ওই সরকার সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না। নির্দলীয় সরকারের ধারণা মূলত বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের সরকারের থেকে পাওয়া। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি বিজয়ী হয়। ফলে মূলত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সমান সংখ্যকবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের যৌক্তিকতা তৈরি হয় ১৯৯৪ সালে মাগুরা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ওই উপ-নির্বাচনে সরকার দলীয় বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে সরকারি প্রভাবে ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির মাধ্যমে বিএনপি তাদের বিজয় ছিনিয়ে নেয়। ১৯৯৪ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল। তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে ১৭৩ দিন হরতাল করে আওয়ামী লীগ ও সমমনা সেই সময়ের রাজনৈতিক দলগুলো। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সংসদের বিরোধী দলের সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন; তবে তাদের পদত্যাগ গৃহীত হয় নি। কিন্তু বর্জনের কারণে টানা ৯০ দিন সংসদে অনুপস্থিত থাকায় বিরোধী দলের সদস্যদের আসন শূন্য হয়। বিষয়টি সে সময় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এক পর্যায়ে ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর পঞ্চম সংসদের বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। এর পর ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ভোটারবিহীন নির্বাচনে গঠিত সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাস হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বলিত ত্রয়োদশ সংশোধন বিল। এতে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে এগারো সদস্যের একটি নির্দলীয় সরকারের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচনে পরাজিত হয় ক্ষমতাসীন দল। সব কটি নির্বাচনেই পরাজিত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দেশে-বিদেশে এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পায়। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার


www.pathagar.com

পর ২০১১ সালের ১০ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এক রায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ সংবিধান পরিপন্থী ও বাতিল ঘোষণা করে। প্রসঙ্গত ১৩তম সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ হয়েছিল প্রথম ১৯৯৬ সালে। সৈয়দ মশিউর রহমান নামের এক আইনজীবী রিট আবেদনটি করেছিলেন। বিচারপতি মোজাম্মেল হক ও বিচারপতি এমএ মতিনের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ তখন রিট আবেদনটি প্রাথমিক শুনানিতেই খারিজ করেছিলেন।

এরপর ১৯৯৯ সালে আবারও চ্যালেঞ্জ করে রিট হয়। বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি আবদুল আউয়াল পূর্বের রায়ের সঙ্গে একমত না হতে পেরে ২০০৩ সালের ২১ জুলাই এ বিষয়ে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানান। ২০০৪ সালের ১৬ জুন বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন, বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর বেঞ্চ মোঃ সেলিমউল্লাহর রিট আবেদন খারিজ করে রায় দেন.। তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আপিলের অনুমতি দেন হাইকোর্ট। ২০১১ সালের ১ মার্চ থেকে ওই আপিলের শুনানি শুরু হয়। এই আপিলের শুনানিতে সুপ্রিমকোর্টের আটজন সিনিয়র আইনজীবী অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে বক্তব্য দেন। এঁদের মধ্যে পাঁচজন অ্যামিকাস কিউরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে সরাসরি মত দেন। এছাড়া দু'জন আইনজীবী এ ব্যবস্থার সংশোধনী আনার পক্ষে মত দেন। শুধুমাত্র একজন আইনজীবী বাতিলের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আপিল বিভাগ ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের পক্ষে রায় দেন। আপিল বিভাগের এ রায়টি সর্বসম্মত ছিল না। সাতজন বিচারকের মধ্যে চারজন বাতিলের পক্ষে এবং তিনজন বিপক্ষে অভিমত দেন। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ মিলিয়ে মোট ১২ জন বিচারক ত্রয়োদশ সংশোধনীর মামলাটির শুনানি গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে মূলত ৮ জন ত্রয়োদশ সংশোধনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে এবং মাত্র চারজন বিচারক বাতিলের পক্ষে রায় দেন। শুধু তাই নয়, সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ সংশোধনীর এ রায়টি দেশের ইতিহাসে একটি আলোচিত ও বিতর্কিত রায় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এই ইস্যুতে দেশে


www.pathagar.com

একটি সংঘাতময় পরিস্থিতির আশংকা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের দাবি জানায় নি। বরং বিভিন্ন মহল থেকে এর যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা দূর করার দাবি উঠেছিল । কিন্তু আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদ ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলুপ্ত ঘোষণা করে। যে সকল রাজনৈতিক দল একদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সে সব রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের বিলে ভোট দেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেদিন যেই যুক্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির বিরোধিতা করেছিলেন, সেই একই যুক্তি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলেন আজকের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একই যুক্তিতে এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আদেশটি বদলে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। মামলার রায়ে আপিল বিভাগের বিচারক বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিঞা স্বয়ং এ অভিযোগ করেছেন। তিনি তাঁর রায়ে লিখেছেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সংক্ষিপ্ত আদেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সংক্ষিপ্ত আদেশ বদলে ফেলার ঘটনাকে আইন বিশেষজ্ঞরা বিচারিক অসততা বলে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া একদিকে "নির্বাচনের ৪২ দিন আগে সংসদ বাতিল" এবং অন্যদিকে "নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন" অভিমতটি স্ববিরোধী বলেও মনে করেন আইন বিশেষজ্ঞরা। রায়েও এক বিচারপতি এই স্ববিরোধিতাকে চিহ্নিত করেছেন।

আইনজীবীরাও অভিযোগ করেছেন মূল রায়ের একটি শর্ত সংক্ষিপ্ত আদেশের সঙ্গে মিল নেই। প্রসঙ্গত, সংক্ষিপ্ত আদেশে আরো দুই মেয়াদে শুধুমাত্র বিচারকদের বাদ দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অভিমত ছিল। কিন্তু প্রকাশিত রায়ে বিচারপতি খায়রুল হক তিন শর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দুই মেয়াদে নির্বাচনের কথা বলেছেন। শর্তগুলো হলো: ১. জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের বাদ


www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে, কারণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে তাঁদের সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। ২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু জনগণের নির্বাচিত সাংসদদের দ্বারা গঠিত হতে পারে। কারণ, জনগণের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, প্রজাতান্ত্রিকতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ৩. ওপরে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলেও বহাল থাকবে। আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দুই নম্বর শর্তটির কারণে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পথ বন্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেন, প্রকাশ্য আদালতে এক রকম আর পূর্ণাঙ্গ রায়ে আরেক রকম এটি বিচারিক অসদাচরণ। তিনি বলেন, প্রকাশ্য আদালতে রায়ের মূল অংশ যখন পাঠ করা হয় তখন আরো দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখা যায় বলে অভিমত ছিল। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেনও এ ঘটনাকে গুরুতর বিচারিক বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেছেন। তবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর হয়তো কিছু ত্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে। কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ ২০০৬ সালে সংবিধানের বিধান যথাযথভাবে মান্য না করেই নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বুকে পেরেক ঠুকে দেন। তবে প্রথম দফা পেরেক ঠুকার কাজটি করে বেগম খালেদা জিয়ার নের্তৃত্বাধীন সরকার। তাদের আমলে ২০০৪ সালে ১৭ মে জাতীয় সংসদে পাস হয় চতুর্দশ সংশোধনী আইন। খোলা চোখে এই সংশোধনীকে একটি নির্দোষ সংশোধনী মনে হলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন এই সংশোধনী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বুকে প্রথম পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। সংশোধনীটি ছিল মূলত সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করা সংক্রান্ত। সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী বিচারকদের বয়স বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। তৎকালীন বিএনপি সরকার বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীর এই পত্রটি কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখে। বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী অবসরে যাওয়ার পর বিচারপতি কেএম হাসান প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। মূলত বিচারকদের বয়স বাড়িয়ে তাঁকে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হিসেবে রেখে দেয়ার হীন স্বার্থেই এই সংশোধনীটি আনা হয়। বিএনপির এই চালাকি দেশের মানুষের


www.pathagar.com

কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ চার দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই বিচারপতি কেএম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়ার বিরোধিতা করেন। এ নিয়ে দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলন গড়ে উঠে। যদিও শেষ পর্যন্ত বিচারপতি কেএম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সংবিধানের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত সংশোধনী হচ্ছে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী। জাতীয় সংসদে ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন-২০১১ পাস হয়। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে বিলটি পাসের পক্ষে ২৯১ ও বিপক্ষে মাত্র একটি ভোট পড়ে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত, বিতর্কিত এবং বিপদজনক সংশোধনী হচ্ছে ৭(খ) অনুচ্ছেদ। এতে বলা হয়েছে, "এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।" এ প্রসঙ্গে ৭(১) অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, " এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডের হইবে। বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২৪(ক) ধারায় এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞরা ৭ (১) অনুচ্ছেদের (খ) উপ-অনুচ্ছেদকে একটি বিপদজনক অনুচ্ছেদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, আদর্শিক কারণে কোন ব্যক্তি বা দল এই সংবিধানের কোন বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। এখন যদি তাদের এই অবস্থানের কারণে বা বক্তৃতা-বিবৃতির কারণে সংবিধানের কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত হয়, তাহলে তারা বা ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হবেন। তিনি বলেন, কোন আধুনিক বা সভ্য দেশের সংবিধানে এ ধরনের বিধান থাকতে পারে না।

আরেকটি আলোচিত সংশোধনীটি হচ্ছে সংবিধানে ৭(খ) অনুচ্ছেদটির সংযোজন। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানেও এই বিধানটি ছিল না। ৭(খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না


www.pathagar.com

কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

প্রসঙ্গত, সংবিধানের প্রথম ভাগের ২(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন। এছাড়াও সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক, অফিস-আদালতে জাতির পিতার প্রতিকৃতি স্থাপন, সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিধানের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া সংবিধানের প্রথম ভাগে সর্বমোট ৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলো কোনভাবেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে ৮ থেকে ২৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলোকেও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে চিরস্থায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের ৮(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় ভাগে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশনা, সম্পদের মালিকানা নীতি, সুযোগের সমতা, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইত্যাদি রয়েছে।

তৃতীয় ভাগে ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই অংশে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন বাতিলের নির্দেশনা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্মের কারণে বৈষম্য না করা, নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং চিন্তা-বিবেক ও বাক স্বাধীনতা ইত্যাদির অধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের ১৫০ (২) অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার টেলিগ্রাম, ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ইত্যাদি সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সব বিধানের কোন অংশই সংশোধন,


www.pathagar.com

সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা বাতিল করা যাবে না।

প্রসঙ্গত, এমন ধরনের একটি বিধান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে (১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ) সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এতে উল্লেখ ছিল 'এই সংবিধানের প্রস্তাবনায় অথবা ৮, ৪৮ বা ৫৬ অনুচ্ছেদ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোন বিধানাবলী সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের ৭ দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিবেন কি করিবেন না এ প্রশ্নে গণভোটের ব্যবস্থা করিবেন।' কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোটের বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে তিনশ জন সংসদ সদস্য চাইলেও পরিবর্তন আনতে পারবেন না। তিনি বলেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এই বিধান রাখায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। যারা এই সংশোধনী করেছেন, তাদের নৈতিক সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো অবকাশ আছে। তিনি প্রশ্ন করেন–আপনি যদি সংবিধানের মূল চারনীতিতে বিশ্বাস করেন, তাহলে পঞ্চদশ সংশোধনীর ওই বৈপরীত্য কিভাবে সমর্থন করবেন?

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত আরেকটি বিতর্কিত সংশোধনী হলো ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদ। এতে বলা হয়, "সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে–মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে। ওই বিধানের কারণে সংসদ বহাল রেখেই নির্বাচন কমিশনকে আরেকটি সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। ওই সময়ে সংসদ সদস্যরা তাদের দায়িত্বে থাকবেন। এমনকি আগের সংসদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন সংসদের নির্বাচিতদের শপথ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদের শর্তাংশে বলা হয়েছে, "তবে শর্ত থাকে যে (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লেখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।"

এদিকে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা


www.pathagar.com

২০০৮-এর ১৪ ধারায় উল্লেখ রয়েছে : "(১) সংসদের কোন শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী কিংবা উক্ত মন্ত্রীদের সম্পন্ন সরকারি সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না; তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।"

এ বিধানটি করা হয়েছিল সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে। অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো সংসদের মেয়াদশেষে অথবা সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর। ফলে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কারোই কোন পদমর্যাদা ছিল না। বর্তমানে সংসদ বহাল থাকলে এবং মন্ত্রী ও এমপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক হলে আইনগত জটিলতা এবং সংবিধানের সমতার নীতি লঙ্ঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোটের বিধানও বাতিল করা হয়। পঞ্চম সংশোধনীতে ১৪২ অনুচ্ছেদের নামে (১ক) একটি উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছিল । এতে বলা হয়, এই সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮ (মূলনীতি), ৪৮ (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত) ও ৫৬ (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত) অনুচ্ছেদ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোন বিধানাবলীর সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ কোন বিল রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের ৭ দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি গণভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।" কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীতে তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হয়। প্রসঙ্গত পঞ্চম সংশোধনীর বাতিলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ গণভোটের এই বিধানটি বাতিলের নির্দেশ দেয়। এর ফলে জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কোন ইস্যুতে বা সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ কোন সংশোধনীর ক্ষেত্রে জনমতামত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ৫ম সংশোধনী বাতিল করার পর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন ও


www.pathagar.com

পরিচালনার সুযোগ করে দেয়া হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালে মূল সংবিধানে 'ধর্মভিত্তিক বা ধর্মীয় নামযুক্ত' কোন রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ ছিল না। ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়নি।

শেষ কথা :

সংবিধান নিয়ে দেশে জাতীয় ঐকমত্য নেই। চার মূলনীতির বিষয়েও ব্যাপক বিরোধ রয়েছে। যখন যেই দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে সেই দলই তার মত করে সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করেছে। সংবিধানের ওপর সামরিক শাসকদেরও হাত পড়ে। বর্তমানে সংবিধান একটা জগাখিচুড়ি অবস্থায় রয়েছে। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; অন্যদিকে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রাখা হয়েছে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহ'র নামে) এই শব্দ কটি ছিল না। সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই শব্দগুচ্ছ যুক্ত করেছিলেন। ৫ম সংশোধনী অবৈধ হলেও সংবিধান থেকে বাদ যায় নি এটি। এই বৈপরীত্য নিয়েই আমাদের বসবাস। আমি মনে করি, দেশের মানুষ এই বৈপরীত্য চায় না–তারা সংবিধান নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্য চায়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আলোকে মূলনীতি নির্ধারণ করতে পারলে সংবিধান থেকে অনেক বাহুল্য শব্দ বাদ দোয়া সম্ভব।

• লেখক : সভাপতি, ল রিপোর্টার্স ফোরাম এবং দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক



www.pathagar.com

# গণপরিষদ কার্যক্রম

মাশহুদুল হক

আমাদের সংবিধান হচ্ছে বাংলা ভাষায় লেখা বিশ্বের একমাত্র সংবিধান। সর্বমোট ২১টি অধিবেশনে ৬ মাস ২৮ দিনে (১১ এপ্রিল থেকে ৪ঠা নভেম্বর) গণপরিষদ লাখো শহীদের রক্তের আকরে লেখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে এক ইতিহাস রচনা করে। গণপরিষদের প্রথম বৈঠক থেকে সংবিধান কার্যকর হতে সময় লাগে মাত্র ৮ মাস। সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গণপরিষদ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তির পর ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্ট ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য খসড়া কমিটি গঠিত হয়। কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে সেটি ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বরের মধ্যে গণপরিষদে পেশ করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকর হয়। গণপরিষদ সংবিধান রচনা করতে প্রায় ৩ বছর সময় নিয়েছিল।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া ১৯৫৬ সালে শেষ হয়। ইতিমধ্যে প্রথম গণপরিষদ বিলুপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় গণপরিষদ এ দায়িত্ব পালন করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর ওই সংবিধান বাতিল করা হয়। ১৯৬২ সালে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা এককভাবে একটি সংবিধান চাপিয়ে দেন। ১৯৬৯ সালে এ সংবিধানও বাতিল হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় পাকিস্তানের কোনো সংবিধান ছিল না।[১] ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে করা হয় আরেকটি সংবিধান।

১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন



www.pathagar.com

কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেন : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমাদ, এএইচএম কামারুজ্জামান, এম আবদুর রহিম, আবদুর রউফ, মো. লুৎফুর রহমান, আবদুল মোমিন তালুকদার, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ, আমীরুল ইসলাম, বাদল রশীদ বার এট ল', খন্দকার আব্দুল হাফীজ, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মনজুর, শওকত আলী খান, মো. হুমায়ুন খালিদ, আছাদুজ্জামান খান, এ.কে মুশাররফ হোসেন আখন্দ, আব্দুল মমিন, শামসুদ্দীন মোল্লা, শেখ আবদুর রহমান, ফকির সাহাবউদ্দিন আহমদ, আবদুল মুন্তাকীম চৌধুরী, অধ্যাপক মো. খোরশেদ আলম, সিরাজুল হক, দেওয়ান আবুল আব্বাছ, হাফিজ হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মুহাম্মদ খালেদ, মিসেস রাজিয়া বানু, ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল এবং ড. কামাল হোসেন। কামাল হোসেন এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[২]

এই কমিটি বাহাত্তর সালের ১৭ই এপ্রিল প্রথম বৈঠকের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করে। কমিটি সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবিধান সম্পর্কে প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রদানের জন্য জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানায়। এসব প্রস্তাব পাঠানোর সর্বশেষ তারিখ ছিল বাহাত্তর সালের ৮ই মে। এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কমিটি ৯৮টি স্মারকলিপি পাওয়া যায়।[৩]

১৭-২৯ এপ্রিল পর্যন্ত একাদিক্রমে কমিটির ১৩টি ও ১০-২৫ মে পর্যন্ত ১৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ২৯টি বৈঠকে প্রতিটি খসড়া বিধান নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়। ফলে বেশীর ভাগ অনুচ্ছেদ ও দফা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ২৫শে মে অনুষ্ঠিত কমিটির সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, খসড়া বিধানাবলী নিয়ে সদস্যগণ যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার ভিত্তিতে সংবিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করা হয় এবং ৩ জুন কমিটির বৈঠকে তা উপস্থাপিত হয়। কমিটি এই খসড়াটি দফাওয়ারী পর্যালোচনা করে ১০ জুন কমিটি কর্তৃক খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়। এরপর কমিটির মতানুযায়ী খসড়া সংবিধানের পাঠ আইনগত খসড়া রচনাকারীদের এবং বাংলা ভাষার পণ্ডিতদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমার্জিত খসড়া সংবিধানের একটি পাঠ ১০ আগস্ট কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। এরপর ১০ আগস্ট থেকে ১


www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর এবং ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত কমিটি আবারো এই পাঠের পর্যালোচনা করে। কোন কোন বিষয়ে কমিটির ৬ জন[৪] সদস্য সংখ্যগরিষ্ঠ মত সমর্থন করেন নি এবং মতানৈক্যমূলক মন্তব্য সংযোজন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করার জন্য কমিটি এ বিষয়ে মতানৈক্যমূলক মন্তব্য সংযোজনসহ একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে খসড়াটি গণপরিষদে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫]

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্পীকার মুহম্মদুল্লাহ[৬] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেনকে রিপোর্টসহ খসড়া সংবিধান বিল পেশ করার অনুরোধ করেন। কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, "মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি এই কমিটির রিপোর্ট এবং সেই সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য সংবিধান বিল পেশ করছি।" খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়, "যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"[৭]

সংবিধান বিল উত্থাপন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী ও কমিটির সভাপতি কামাল হোসেন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আজ আমি সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই বীর শহীদদের স্মরণ করি যাঁরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছেন। যাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সুযোগ পেয়েছি। বাংলা ভাষায় খসড়া সংবিধান পেশ করতে পেরেছি, এ কারণেও আজকের দিন আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখের দিন। বাংলা ভাষার ইতিহাসেও এটা স্মরণীয় ঘটনা। রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে মহান পর্ব রচনা করেছিল, তার যোগ্য পরিণতি আজ ঘটলো। সংবিধানকে বলা হয় একটা দেশের মৌলিক আইন বা সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান জনগণকে প্রেরণা দেবে এবং জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী সমাজ গঠনের ভিত্তি সংস্থাপন করবে, এটা আশা করা যায়। আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, জনগণ যে ক্ষমতার মালিক, সেই ক্ষমতা আইনসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করার জন্য কতকগুলো প্রধান অঙ্গ সংবিধানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে দেশের এরকম মৌলিক আইন আছে, সে দেশে কোন ব্যক্তি বা কোন রাষ্ট্রীয় অঙ্গ সেই আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারে না। এই জন্যই বলা হয় যে, সাংবিধানিক সরকারে ব্যক্তির শাসন নয়,


www.pathagar.com

আইনের শাসন প্রবর্তিত হয়। সংবিধান প্রণয়নের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে শুধু আমাদের বর্তমান জনগণ নন, পৃথিবীর মানুষ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের প্রচেষ্টাকে বিচার করবেন। এই কথা ক'টি বলে আমি গণপরিষদে সংবিধান-বিল উত্থাপন করছি।"[৮]

গণপরিষদে সংবিধান বিল পেশ করার পর সাত দিন ধরে জাতীয় দৈনিকগুলোতে ধারাবাহিকভাবে খসড়া সংবিধানের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে করে জনসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। ১৯ অক্টোবর গণপরিষদে সংবিধান বিষয়ে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন এদিন সংবিধান-বিলটি অবিলম্বে বিবেচনার জন্য পরিষদের স্পীকারকে অনুরোধ করেন এবং স্পীকার সংবিধান-বিলটি অবিলম্বে বিবেচনার জন্য পরিষদ সদস্যদের সাধারণ আলোচনার আহ্বান জানান। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সংবিধান-বিলের ওপর সাধারণ আলোচনা অব্যাহত থাকে। অনেক সংযোজন-বিয়োজনের পর ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হয় সংবিধান-বিল বিবেচনার দফাওয়ারী পাঠ। গণপরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধানের প্রতিটি দফা স্পীকার পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে পাঠ করেন এবং দফাটি সম্পর্কে সদস্যগণের কোনরূপ ভিন্নমত বা সংশোধনী থাকলে সেটা নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনার পরই কেবল ভোটাভুটির মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি বিধান করে দফাটি গৃহীত হয়। আলোচনা-পর্যালোচনার সমাপ্তিতে প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে চতুর্থ তফসিল পর্যন্ত আলাদাভাবে সব দফা ধ্বনি ভোটে গৃহীত হওয়ার পর গণপরিষদ সদস্যদের সামনে চূড়ান্তভাবে সামগ্রিকতায় খসড়া সংবিধানের সংশোধিত-পরিমার্জিত রূপটি গ্রহণ করার কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ উপস্থিত হয়।[৯] ১৯৭২ সালের ৩রা নভেম্বর থেকে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর ৪ঠা নভেম্বর ভোর ২টা ২৮ মিনিটে সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে স্পিকার মুহাম্মদ উল্লাহর সভাপতিত্বে পরিষদ ভবনে গণপরিষদের কার্যক্রম শুরু হয়। সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে গণপরিষদের বিতর্ক নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো।[১০]

**৩রা নভেম্বর ১৯৭২**

**ড. কামাল হোসেন :** মাননীয় স্পীকার সাহেব, সংক্ষেপে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাচ্ছি। বিভিন্ন সময়ে এই প্রশ্নগুলি তিনি তুলেছেন। যেহেতু এ ব্যাপার নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, তার জন্যই আমি তাঁর


www.pathagar.com

এক একটা point এর উপরে উত্তরের আকারে আমার বক্তব্য রাখতে চাচ্ছিলাম।

এই আইনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। Schedule Offences, Collaborator আইন। এছাড়া, আর একটা হল Criminal Law। দ্বিতীয়তঃ Services আইনের কারণগুলি এখানে আমি আপনার সামনে পেশ করেছি। তৃতীয়তঃ, এই Category-র বেশীর আইন আছে যেগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্তের কথা রয়েছে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে আইন করা হয়েছে, সেগুলিকেই এখানে একমাত্র 'প্রটেকশন' দেওয়া হচ্ছে।

তিনি কেমন করে বললেন যে, Indian Constitution -এ যে ধরনের আইন করা হয়েছে, সেগুলি থেকে এগুলি অন্য ধরনের? Indian Constitution এ ৬৪টা আইন Schedule এ রাখা হয়েছে। ভারতের Ninth Schedule এ আছে। সেখানে ৬৪টা আইনকে প্রটেকশন দিতে তারা বাধ্য হয়েছে। কেননা সেগুলি land reforms legislation। সব কয়টাই আদালতে গিয়ে তাদের 'প্রোগ্রাম' বানচাল হয়ে যাচ্ছিল। তাই ৬৪টা আইনকে সেখানে তাদের প্রটেকশন দিতে হয়েছিল। সে আইন আর আমরা যেগুলি করেছি সেটার মধ্যে মিল নাই।

তিনি যখন বললেন, তখন আমি দু-একটা কথা উল্লেখ করব। সেখানে Land Holding Limitation Act -এ ৪টা আইন আছে। তার সঙ্গে আমাদের ৯ নম্বর আদেশ হুবহু এক যেটা আমরাও রেখেছি। তারপর State Acquisition Act, Agriculture Land Revenue Act, Land Reforms Act ইত্যাদি যতগুলি আছে, সেগুলিতে বিশেষ করে land reform রক্ষা করা হয়েছে।

সম্পত্তি সম্পর্কে আমাদের যে আইন আছে, সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ৯৮ নম্বর আদেশে একটা সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেটা আছে এবং যেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে, সেগুলির জন্যও আইন করা হয়েছে।

৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদ যদি তিনি দেখেন, যেখানে আমাদের যে উদ্দেশ্য, সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেখানে বলা হয়েছে, অন্যান্য আইনের সঙ্গে এই দুইটা আইন- Criminal Law এবং Services আইন- সংসদ পরিবর্ধন করে দিতে পারবে। যখনই তারা দেখবে যে, এটার প্রয়োজন নেই, তখনই সংসদ এটা repeal করতে পারবে। এগুলি সংবিধানেরই বিধান। এটা আইনে দেওয়া হচ্ছে না বলে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিয়েছে।

৯ নম্বর আদেশকেও সংবিধানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটাকে


www.pathagar.com

repeal করা যাবে না। Screening order, Collaborator আইন, Schedule offences order-এগুলি সম্বন্ধে সংসদ যদি মনে করে যে, দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং এই আইনের আর প্রয়োজন নেই, তা হলে তারা simply এটা repeal করবে।

থাকল অন্য আইন। অন্য আইনেও special protection আমরা দিয়েছি। যদি কোন সম্পত্তি ফেরত দিতে হয় বা যে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে, সেটা যদি ফেরত দিতে হয় এবং যেখানে ক্ষতিপূরণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যদি কেউ বাড়াতে চায়, তাহলে কীভাবে সেটা করতে হবে। আমাদের যে চিন্তা, যে উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের পথে আমরা অগ্রসর হব, সেই লক্ষ্য সামনে রেখে এ বিধানটা করা হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি, সুরঞ্জিত বাবুর এ ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

তবে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সামনে রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য ভূমি সংস্কার আইনকে যখন 'প্রটেকশন' দিচ্ছি, তখন কারও কিছু বলার নেই। দালালি এবং স্ক্রীনিং সম্বন্ধে আমি বলেছি। এখানে আর কিছু বলতে চাই না।

তাঁর সংশোধনী আমরা গ্রহণ করতে পারছি না এবং যে কারণে গ্রহণ করতে পারছি না তার ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি। সুতরাং, আমি আশা করি, তিনি তাঁর সংশোধনী প্রত্যাহার করবেন।...

**শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত :** জনাব স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে, " চতুর্থ তফসিলের ৫ অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে নিম্নোক্ত ৫ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হোকঃ "৫। এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা- অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবেন।"

**জনাব এ. লতিফ সিদ্দিকী (পি.ই.-১৩৩ : টাঙ্গাইল-৪) বৈধতার প্রশ্ন :**

জনাব স্পীকার সাহেব, স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সব দায়িত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক- মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাব করেছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে পরামর্শ দান করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও ছিলেন। তিনি কি এই প্রস্তাবে তাঁকেও এই মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা বলতে চান? প্রশ্নটির উত্তর আমি আপনার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে চাই।


www.pathagar.com

**শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত :** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে 'না' করেছি, এটা মাননীয় সদস্য কেমন করে বুঝলেন?

এটা আমার বক্তব্য নয়।

আমার এটাই বোধহয় শেষ সংশোধনী ।

মাননীয় আইনমন্ত্রী অত্যন্ত সুকৌশলে সংবিধানে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন। গণপরিষদ ভেঙ্গে যাবে, অথচ মন্ত্রী সাহেবের মন্ত্রিত্ব ঠিকই থাকবে। এই ধরনের নজির বাংলাদেশের এই সংবিধান ছাড়া আর খুব কম সংবিধানেই আছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, গণপরিষদ সার্বভৌম পরিষদ। মুজিবনগরের সার্বভৌম পরিষদ তাঁদের ক্ষমতা দ্বারা যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, সেটাই ছিল প্রকৃত বৈধ মন্ত্রিসভা।

আজকে এই গণপরিষদ যখন এদেশে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন এবং শাসনতন্ত্র-রচনার পর যেহেতু গণপরিষদ ভেঙ্গে যাচ্ছে, সেইহেতু মন্ত্রীদেরও সদস্যপদ থাকতে পারে না। ক্রান্তিকালীন বিধানের বলে মন্ত্রী মন্ত্রীই থাকতে চান। আমার বক্তব্যে হয়তো মন্ত্রিত্ব উড়ে যাবে না। অনেক বড় 'হ্যাঁ' শব্দের দ্বারা তা থেকে যাবে। কিন্তু গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টের ইতিহাসের জন্য আমাদের যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে আমি অনুরোধ করব, এই গণপরিষদের সদস্যগণ তাঁদের সদস্যপদ যখন হারাবেন, তখন এই মন্ত্রিত্বের দাবিদাররাও উত্তরাধিকার হিসাবে আর তা দাবি করতে পারবেন না। এবং এর পর যখন নির্বাচন আসছে, তখন সেই নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করুন।

আমি গণতান্ত্রিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আবার অনুরোধ করছি। গণপরিষদের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদও পদত্যাগ করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন–এই আমার বক্তব্য।

**শ্রী সুবোধ কুমার মিত্র :** জনাব স্পীকার সাহেব, আবার আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না।

কথা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য বলেছেন, গণপরিষদ ভেঙ্গে যাবে, অথচ মন্ত্রিসভা থেকে যাবে। এ উদ্ভট যুক্তি তিনি কোথায় পেলেন, আমি বুঝতে পারি না।

গত ১৯ তারিখের গণপরিষদ অধিবেশনে বলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু।


www.pathagar.com

তিনি আমাদের সবার উপরে আছেন। এখানে তাঁর ছবি সবার উপরে দেখতে পাচ্ছি। সেই মহান নেতা যদি সারা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করতে পারেন, যদি পৃথিবীর লক্ষ কোটি নির্যাতিত মানুষ আজ মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, তাহলে কেন বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেই মহান নেতার কাছে মাত্র নব্বই দিনের জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারবে না। কী উদ্ভট যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন।

মাননীয় সদস্য এই যুক্তি খাড়া করেছেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটা আছে যে, গণপরিষদ ভেঙে যাওয়ার পর নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভা থাকবে। তিনি কখন কী যুক্তি খাড়া করেন, বুঝতে পারি না।

তিনি বলেন দালাল আইনের পক্ষে, আবার তিনি বলেন চোরাচালানি বন্ধ করার কথা। তিনি বলেন গণিকাবৃত্তি উৎখাতের কথা, আবার তিনি বলেন গণিকাদের পুনর্বাসনের কথা। নির্বাচন অত্যন্ত সন্নিকটে। সেই নির্বাচনের ভোগ লুটবার জন্যই ঐ দালাল, ঐ গণিকাদের ভোট নেওয়ার জন্যই তিনি চেষ্টা করছেন।

কিন্তু মুজিব ভাই, আমার আওয়ামী লীগ দালালদের জন্য নয়, সারা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আর, তিনি শুধু মৌলবীদের ভোট নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া কে ভোট দেবে তাঁকে?

ভোট তিনি পান তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে ১৯৬৯ সালের নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গেছে, আওয়ামী লীগ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে চায় না। কিন্তু দেশের মানুষ যদি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেন, তাহলে নিশ্চয় আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করবে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারও নেই।

**জনাব স্পীকার :** অর্ডার, অর্ডার। এখন ড. কামাল হোসেন।

**ড. কামাল হোসেন :** মাননীয় স্পীকার সাহেব, যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, তাই আমরা এই সংশোধনী গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা, সংসদীয় গণতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা জানেন যে,


www.pathagar.com

তাঁরাই শাসনভার গ্রহণ করতে পারেন, যাঁদের প্রতি জনসাধারণ তাঁদের আস্থা প্রমাণ করেছেন একটি নির্বাচনের মাধ্যমে।

যাঁরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে আগ্রহী, তাঁরা জনসাধারণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবেন এবং জনসাধারণ যাঁদের প্রতি সমর্থন দেবেন তাঁদেরই শাসনভার গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

তাই আর বেশী অস্থির হওয়ার কারণ নেই। এখানে কয়েক মাসের জন্য ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং সব দেশেই এটা হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে এই ক্রান্তিকালীন সময়ে care-taker গভর্নমেন্ট হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে এবং এখানে সেই ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে এটা করা উচিত। সংসদীয় গণতন্ত্রে শ্রদ্ধা করি, তাই এই সংশোধনী কোনভাবেই আমরা গ্রহণ করতে পারি না।...

৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২

**জনাব স্পীকার :** ড. কামাল হোসেন আপনি কোনটা উত্থাপন করবেন? আপনি প্রস্তাবনা আগে উত্থাপন করবেন, না সংশোধনী আগে উত্থাপন করবেন?

**ড. কামাল হোসেন :** জনাব স্পীকার সাহেব আমার মনে হয়, প্রস্তাবনাই আগে শেষ হবে।

**জনাব আছাদুজ্জামান খান (এন.ই. ৯০ঃ ময়মনসিংহ-১৫) :** জনাব স্পীকার সাহেব প্রস্তাবে যে সংশোধনী আছে, সেটাই আগে উপস্থাপন করতে হবে। তারপর প্রস্তাবনা পেশ করবেন।

**ড. কামাল হোসেন :** মাননীয় স্পীকার সাহেব, প্রস্তাবনার তারিখ সম্পর্কে যে প্রস্তাব আমার নামে আছে, সেটা হাউসে উত্থাপনের জন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিতে পারেন।...

**এখন প্রশ্ন হল :** "সংশোধিত আকারে এই সংবিধান বিলের প্রস্তাবনা এই বিলের অংশে পরিণত হোক", –যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলুন। [ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর]

আর যাঁরা এর বিপক্ষে আছেন তাঁরা না বলুন।

[ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর]

www.pathagar.com

আমার মনে হয় হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে, হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে, হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, প্রস্তাবটি গৃহীত হল এবং সংশোধিত আকারে 'প্রস্তাবনা' বিলের অংশে পরিণত হল।

**সংবিধান-বিল (গৃহীত)**

**ড. কামাল হোসেন :** মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার অনুমতিক্রমে আমি এই প্রস্তাব করতে যাচ্ছি যে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি সংবিধান প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিষদে স্থিরীকৃত আকারে সংবিধান বিলটি গ্রহণ করা হোক।"

**জনাব স্পীকার :** পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাব হচ্ছেঃ "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি সংবিধান প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিষদে স্থিরীকৃত আকারে সংবিধান বিলটি গ্রহণ করা হোক।"

**শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত :** মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার অনুমতিক্রমে আজকে সারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে, আমি মনে করি, তাঁর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসে দুইটা বিশেষ মুহূর্ত তাঁর জীবনে এসেছে। একটা ছিল ১৬ই ডিসেম্বর-যে দিন তাঁরা বাংলাকে স্বাধীন ও মুক্ত করতে পেরেছিলেন। আর, আজকে, আমার মনে হয়, স্বাধীনতাযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪ঠা নভেম্বর যখন তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ এই সংবিধানের মধ্যে সংহত হতে যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই বিশেষ লগ্নে আমি যে এই গণপরিষদে দাঁড়িয়ে এই সংবিধান প্রণয়নের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি, তার জন্য আমি গর্ব অনুভব করছি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ছাড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একজন নগণ্য সদস্য হিসাবে, আমি মনে করি, আমি আজীবন কৃতজ্ঞতা এবং গর্বের সঙ্গে এই জাতির পাশে থাকব।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, তারপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল : বাঙ্গালী জাতি বুলেটের মাধ্যম ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা জাতি এত তাড়াতাড়ি সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে পারে নাই। আমার মনে হয়, বিশ্বের ইতিহাসে একমাত্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই আজকে তা সম্ভব হয়েছে।


www.pathagar.com

তারপর, একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে এত অল্প সময়ে, মাত্র ১০ মাসের মধ্যে জাতিকে একটা সংবিধান উপহার দেওয়া হল এবং এটাই স্বাধীনতার পর পরই আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জনাব স্পীকার সাহেব, একটা সংবিধান রচনা করতে গেলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে সমগ্র জাতিকে সামনে রেখে সংবিধান রচনা করতে হয় এবং সেই সংবিধানের মধ্যে কিছু কিছু বলিষ্ঠ দিক থাকে, কিছু কিছু দুর্বল দিক থাকে। গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে সেই দিকটা আলোচনা করার অধিকার দেশের মানুষের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিদের থাকে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি সত্যি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব যে, আমি বিরোধী দলের একমাত্র সদস্য হিসাবে এই গণপরিষদে যে সুযোগ পেয়েছি আলোচনা করার, সেটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে আরও একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার এই সংবিধানকে সামনে রেখে প্রায় ৭০টির উপর সংশোধনী আমি এনেছি। আমার মনে হয়, পার্লামেন্টারী ইতিহাসে আর একটা বিস্ময়কর অধ্যায় কালকে এই গণপরিষদে রচিত হয়েছে যে, বিরোধীদলের একটি হলেও সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সংবিধানকে যদি চারিদিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তার একটা বলিষ্ঠ দিক থাকে, দুর্বল দিকও থাকে অনেক। এবং সেই দুর্বল দিকের কথা আলোচনা করার অধিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আছে।

আজকে এই সংবিধান পাস হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার যে সব আপত্তি সেগুলি গ্রাহ্য করা হয় নাই, সেগুলি সম্পর্কে আমার প্রতিবাদ আমি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মনে করি আজকের দিনে অন্তত এইটুকু আশা নিয়ে আমি এই গণপরিষদ থেকে যাব যে এই সংবিধানে যে, সমস্ত আপত্তি আমি তুলেছি সেগুলি যদি এদেশের জনগণের আপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে সে আপত্তি নিশ্চয়ই এই গণপরিষদে আবার গ্রাহ্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সংবিধানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ-ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বেড়াজাল ভেঙ্গে যে নতুন ধর্মনিরপেক্ষ, বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর সামনে স্থান পেয়েছে, তার মূলমন্ত্র যেটা, সেটা হল, একটা জাতির অন্যদিকে উত্তরণ এবং সেই উত্তরণের যিনি কান্ডারী থাকেন,


www.pathagar.com

তাকে নেতা বলে গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই সংবিধানের মাধ্যমে দেখা যাবে যে, কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল, সেই জাতীয়তাবাদের বেড়াজাল ভেঙ্গে আজ সত্যি ধর্মনিরপেক্ষতার আগড়ে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুর্বল দিক যেগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে চাকরিজীবীদের ব্যাপারে, মহিলা আসনের ব্যাপারে। দুর্বল দিক হচ্ছে, সাময়িক কতকগুলি প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার আছে সেগুলি। আর দুর্বল দিক আছে মৌলিক অধিকার হরণের ব্যাপারে। আরও দুর্বল দিক হল প্রধানমন্ত্রীর হাতে অলৌকিক কিছু ক্ষমতা রেখে দেওয়া। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের ডেপুটি লীডার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব আমেরিকান মার্শালের উক্তি করে একটা বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন যে, সংবিধান একটা skeleton এবং তার মধ্যে প্রাণ দেওয়া ক্ষমতাসীন সরকারের attitude এর উপর নির্ভর করে। কতটুকু ভাল করতে পারে, কতটুকু জাতির কল্যাণ করতে পারে–কতটুকু খারাপ করতে পারে তা তারই উপর নির্ভরশীল।

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সরকারের হাতে অপরিসীম। আজকে ক্ষমতাসীন সরকার এই ছয় মাসের যে vacuum এই পার্লামেন্ট থাকা না থাকার মধ্যে তাতে ইচ্ছা করলে জাতিকে যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিণতিতে, যে কোন করুণ পথে নিয়ে যেতে পারে। আবার যদি সরকার জনকল্যাণমুখী কাজ করে সত্যিকারভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ করতে চায়, তাহলে ঐ কাগজে লেখা আইন হয়তো তাদের সেই শুভ বুদ্ধিকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না।

আজকে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত। শেষ করার আগে এ কথা না বলে পারছি না যে, এই গণপরিষদের কর্মচারীবৃন্দ এই সংবিধান রচনার সময় আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। আমরা যখন দিবারাত্র কাজ করেছি, মাননীয় স্পীকার স্যার আপনার সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে তাঁরাও দিবারাত্র কাজ করেছেন। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। পার্লামেন্টারী প্রথা অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য সেই চাকরি অনুযায়ী কিছু এ্যালাউন্স তারা পেয়ে থাকেন। আশা করি, মাননীয় স্পীকার এবং প্রধানমন্ত্রী সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে তিরিশ লক্ষ


www.pathagar.com

শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতাযুদ্ধে সাবেক E.P.R., B.D.R. এবং বিভিন্ন বাহিনীর যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তার জন্য বলব, আজকে তাদের সকলের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির অধিকার, মৌলিক অধিকার এই সংবিধানে স্থান না পেলে আগামী দিনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে এই সংবিধানে তারা তাদের স্থান করে নেবে।

**জনাব স্পীকার :** লীডার অব দি হাউস কিছু বলবেন।

**শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা :** মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের এই শেষ দিনে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে ইচ্ছা করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি বলতে পারি।

**জনাব স্পীকার :** আশা করি পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

**শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা :** মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে শেষ দিনে আমরা আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের শেষ পর্যায়ে এসেছি। আজকে এই শেষ দিনে আমাদের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর যে মনের কথা যে মনের অভিব্যক্তি, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা—এই মহান গণপরিষদে এক পবিত্র দলিল আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি-যে দলিলে থাকে মানুষের চলার পথের ইঙ্গিত, মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, মানব সভ্যতা গড়ে তোলার ইঙ্গিত। মানব মনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের বাস্তব রূপ আজকে এই মহান গণপরিষদে আমরা দিতে যাচ্ছি।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই গণপরিষদের একজন নির্দলীয় সদস্য হিসাবে আমি যে আলোচনা করেছি এই সংবিধানের উপর, সেখানে আমার মনের— যে অভিব্যক্তি, মনের যে আবেগ, মনের যে ধারণা সেটাই আমি সরল মনে ব্যক্ত করেছি আমার বক্তব্যে—একজন সম্পূর্ণ সরল মানুষের মতো। সেখানে ছিল না কোন উদ্দেশ্যমূলক কথা, সেখানে ছিল দেশকে আমি যেভাবে ভালবেসেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবেই এই মহান গণপরিষদে বলেছি।

মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে বলার অধিকার পেয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করছি না। গৌরবান্বিত বলে মনে করছি তাঁদেরকে, যারা সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর মনের কথা এখানে বলার জন্য আমাকে গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। আমি তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।


www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একজন নির্দলীয় সদস্য হিসাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছি এবং আমাকে মাননীয় সদস্য-সদস্যা ভাই-বোন, মাননীয় স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার যে সময় দিয়েছিলেন কথা বলার, সেটা আমি মনে করি এই মহান গণপরিষদে গণতান্ত্রিক অধিকারের একটা ঐতিহাসিক স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সংবিধানের আলোচনায় আমি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম, সে সব প্রশ্ন এখানে গৃহীত না হলেও আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যারা কলকারখানায় চাকরি করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যারা দিন-রাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যারা রাস্তার রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে 'আমাকে একটা পয়সা দাও' বলে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলেছিলাম আর একটা অংশের কথা, যে অংশ নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা–যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে অধিকারহারা দেহ উপজীবী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সেসব কথার অবতারণায় আমার মনের মধ্যে কোন কূটিলতা বা দুরভিসন্ধি ছিল না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে এই মহান গণপরিষদে সেইসব কথা বলার যে অধিকার আমি পেয়েছি, আমি মনে করি, এই মহান গণপরিষদে সেটা গণতান্ত্রিক অধিকারের একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজ যে সংবিধান এই মহান গণপরিষদে গৃহীত হাবার শেষ পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংবিধানে বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ- বিদ্বেষ কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার একটা ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তা-ই হোক।

আসুন শপথ করি, যেন আমাদের চেষ্টা সফল হয়, যেন শোষণহীন সমাজ বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর যেন রাস্তায় রাস্তায় স্লোগান না হয়, 'আমাদের দাবি মানতে হবে।' আর যেন মিছিল না হয়, 'আমাদের দাবী মানতে হবে,'


www.pathagar.com

'সংগ্রাম চলবে সংগ্রাম চলবেই' বলে। সেই অবস্থা আর যেন না হয়। আমরা যেন আমাদের জন্মভূমি গড়ার কাজে ভাল করে মনোনিবেশ করতে পারি।

আজ এই সংবিধান যাদের রক্তে এল, তাদের কথা যেন ভুলে না যাই। অতীতের ভুলের ইতিহাস, অতীত অভিজ্ঞতা, অতীতের মানব-সভ্যতা, মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষার যে সংগ্রাম, আজ এই সংবিধানে তা সন্নিবেশ করে আমাদের ইতিহাস বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে আমাদের এই ইতিহাস বিশ্বের মধ্যে অনন্য হয়ে থাকতে পারে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব লোকদের যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ কেটে এই দেশ গড়ার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশকে তাড়াবার জন্য যাঁরা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু, কারাগার, মিলিটারীর বেয়নেট, লাঠিচার্জ সহ্য করে জীবন দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁদেরকে, যাঁরা নিজেদের জীবন বলি দিয়েছিলেন, জেল খেটেছিলেন এবং এদেশ থেকে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেসব ভাইবোন সেই সরকারের কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছিল, সেসব ভাই-বোনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্বাধীনতার জন্য যেসব মা-বোন রক্ত দিল, যার জন্য আজ আমরা এই গণপরিষদে দাঁড়াতে পেরেছি, সেই মা-বোনদেরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সেইসব বীর মুক্তি-পাগল লোকদের যারা আজ পঙ্গু হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, যার জন্য তাঁরা অসীম দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করছেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ছাত্র সমাজকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীকে।

সর্বশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতির শ্রদ্ধেয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে আজ এই মহান গণপরিষদে কোটি কোটি মানুষের জন্য এই পবিত্র দলিল রচিত হয়েছে।

ধন্যবাদ।

**জনাব স্পীকার :** এখন লীডার অব দি হাউস বক্তৃতা করবেন।


www.pathagar.com

সদস্যগণ : জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; পরিষদ-নেতা) :** জনাব স্পীকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম যে, বাঙ্গালীরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছে। বোধহয় না– সত্যিই এটা প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন। আজ আমাকে স্মরণ করতে হয়, আমাকে অনেকদিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। তদানীন্তন ভারতবর্ষ বাংলাদেশ যাকে আমার sub-continent বলতাম, সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে, তার হিসাব করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই রক্তদান বেশী করেছে। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মা-বোনদের কাছে।

বাংলার এমন কোন জেলা মহকুমা ছিল না যেখানে ইংরেজ আমল থেকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল।

তারপর, বাংলাদেশের অফিসাররা বহু যুদ্ধ করে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বারবার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা জেল ভোগ করেছে অনেক। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দুঃখ, বাঙ্গালী জীবনে সুখ কোনদিন আসেনি। বাংলার সম্বন্ধে ঠাট্টা করে আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমিই তোমার দুঃখের কারণ। তাই বারবার দেখা গেছে শকুনিরা এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ, তারা এদেশের অর্থ সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল।

জনাব স্পীকার সাহেব, সমস্ত দুনিয়া এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে যারা শোষক ছিল, তারা বাংলার অর্থ–বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে বাংলার মাটি থেকে। গৃহহারা সর্বহারা কৃষক, মজুর দুঃখী বাঙ্গালী, যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, খাবার পায় নাই, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে বোম্বের বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে মাদ্রাজ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচী, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামাবাদ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে লাহোর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ডান্ডি, গ্রেট বৃটেন। এই বাংলার সম্পদ বাঙ্গালীর দুঃখের কারণ ছিল।


www.pathagar.com

সংগ্রামী বাঙ্গালীরা বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ ঘোষণা করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। কারণ বাঙ্গালী আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে।

স্মরণ করতে হয়, শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা। স্মরণ করতে হয় সোহরাওয়ার্দীর কথা। আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা, যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেইসব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যাঁরা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল নয় মাসই হয় নাই–স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই।

নয় মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু করেছি বহুদিন থেকে।

১৯৪৭ সালে সংখ্যায় 'মেজরিটি' থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা সব কিছু হারিয়ে ফেলল। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব যাঁকে অনেকে তখন নেতা বলে মানতাম, বাঙ্গালীকে এক শকুনির হাত থেকে আর এক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচীতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি, জিন্নাহ সাহেব মরার সময় যে ফববফ দিয়েছিলেন সেই ফববফ এর ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচীর স্কুলকেও দান করেছিলেন; কিন্তু বাংলার কোন মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই।

বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি– এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোন দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন অর্থ পাই না বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙ্গালী জাতি আমরা পরশ্রীকাতর এত বেশী। ইংরেজী ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা বলে কোন শব্দ নাই'–একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া।

এই কারণে বাঙ্গালীদের যেমন ত্যাগ, সাধনা করার শক্তি ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাব দেখা দেয়। যে সকল বাংলাদেশের নেতা সংগ্রাম করেছেন, আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই। আমরা বুঝেছি, আমাদের নেতা বুঝি চলে এসেছেন সেই বোম্বে থেকে মিস্টার


www.pathagar.com

জিন্নাহ। যা হোক, সে ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের পরবর্তী করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, ১৯৫২ সালে আপনি যখন আমার কাছে অফিসে এসে বসেন, তখন একখানা ভাঙ্গা চেয়ার, একটা ভাঙ্গা টাইপরাইটার মেশিন আর একজন কর্মী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। সে কথা বোধহয় আপনার মনে আছে স্পীকার সাহেব। তখন আমি আড়াই বৎসর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

১৯৪৭ সাল থেকে বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনী করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমের শক্তিকে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে একদল লোক ছিল, যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে, তাদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়েছে, আর বারবার চরম আঘাত করেছে আমাদের উপর। আঘাত করেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫৪ সালে। এমন কি যখন ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র হয়, তখন বাঙ্গালীরা পরিষদ থেকে ওয়াক আউট করে। তখনও বাঙ্গালীর মধ্যে কিছু লোক বেইমানী করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মিলায় মন্ত্রিত্বের লোভে।

১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙ্গালীকে শোষণ করার জন্য। তারা যখন দেখেছে, বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করেছে। তাদের শক্তি ছিল একটা। সেই শক্তি ছিল তাদের সামরিক বাহিনী।

ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকাকে বেছে নিয়েছিল, যেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক রিক্রুট করা হত। বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করা হত না। বাঙ্গালীকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হত না, কারণ বাঙ্গালীরা বিদ্রোহ করে– এই হচ্ছে তাদের দোষ।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙ্গালীরা সংখ্যায় বেশী ছিল, বুদ্ধিতে বাঙ্গালীরা ভাল ছিল, লেখাপড়া বাঙ্গালীরা ভাল জানত, আক্কেল তাদের বেশী ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙ্গালীদের ছিল, যার জন্য বারবার বাঙ্গালী মার খেয়ে গেল। যদিও আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি।


www.pathagar.com

সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হক ঘরের মধ্যে অন্তরীণ। আমি সহ ৫০ জন সহকর্মী, যাঁরা তদানীন্তন এমএলএ ছিলেন, এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মী গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে যায়।

সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। তখন মানুষ একটু স্থান দিত না, কারও বাড়ীতে জায়গা পেতাম না, আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না।

সে যুগে ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এদেশে বিরোধী দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিল তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আরও স্মরণ করি তাদের কথা, এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথঘাট, রাস্তা, রাজপথ বাংলার যে সমস্ত ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, মা-বোন জীবন দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ শেষ হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্রহারা। কত বোন আজ স্বামীহারা। কত পিতা আজ সন্তানহারা। কত সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে বলেছিলাম, যে জাতি রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনও কেউ পদানত করতে পারে না–সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে।

অনেকে দালালি করেছেন প্রগতির নামে। এহিয়া খানের দালালি করেছেন আইয়ুব খানের দালালি করেছেন।

অনেকের তখন জন্ম হয় নাই রাজনৈতিক জীবনে– তাঁরাও অনেক সময় সমলোচনা করেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন–কোন সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।


www.pathagar.com

গত সংগ্রামের সময় ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং যখন আমার বাড়ীতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে-গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর উপর বাঙ্গালী ই.পি.আর-এর উপর, বাঙ্গালী পুলিশের উপর, বাঙ্গালী রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। আর যারা এদেশের দুঃখী মানুষ তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায়, ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সেদিন সেই অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে ২৫ তারিখ রাত্রে।

যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো, এই বুঝি আমার শেষ। তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম, কেমন করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দেই এবং তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম তাদের কাছে। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত আমি দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

[এই পর্যায়ে তিনি কেঁদে ফেলেন]

সে আগুন আমি দেখেছি। শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের আমার বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

মানুষ যে এত পশু হতে পারে, জনাব স্পীকার সাহেব, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। হালাকু খাঁর গল্প পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর গল্প পড়েছি, হিটলারের গল্প পড়েছি, মুসোলিনীর গল্প পড়েছি; কিন্তু মানুষ যে এত পশু হতে পারে, তা দেখিনি। দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে লিখে দিয়ে 'বল জয় বাংলা' গাছের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। মানুষ কেমন করে এত পশু হতে পারে! ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে কেমন করে! লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে তারা হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তারা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে


www.pathagar.com

হত্যা করেছে। সে রক্ত আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়।

আওয়ামী লীগ, আমি বা সহকর্মীরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে বহু ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে ওয়াদা করেছিলাম, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙ্গালীরা ভোগ করবে। সেইজন্য এই সংগ্রাম করেছিলাম।

জনাব স্পীকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনেক সময় ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা ঘরবাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল সবাই। এই এ্যাসেম্বলীর এমন কোন মেম্বার নাই যার ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজন হত্যা করা হয় নাই।

অনেকে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কার বিরুদ্ধে মানুষ বলে? যে কাজ করে তারই বিরুদ্ধে মানুষ বলে। যে কাজ করে না তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না।

আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য আমার কর্মী ভাইবোন আছে, যাদের ঘরবাড়ী এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায়নি। সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আমার সহকর্মীরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। সেদিন আমি তাদের কাছে নেই। আমি ঘোষণা করে বলে দিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় এক সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হোক এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেনি, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেননি। সেই ভাঙ্গাচোরা দল নিয়ে, অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে তারপর তারা পুরোদমে সংগ্রাম করেছিল।

নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক বাংলার মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, নির্ভীক সাবেক ইপিআর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারীদের এক অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল তাদের হাত থেকে। তখন তারা অস্ত্র পায়নি অন্যান্য জায়গা থেকে। দেশের মধ্য


www.pathagar.com

থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করেছিল। সেইভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ভাল ভাল অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পদানত হয়নি বাঙ্গালী।

সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যারা বসে আছেন পঙ্গু হয়ে। তাদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য ট্রাস্ট করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয়ে। সেখানে তাঁরা পেনশন পাবেন সারা জীবন।

স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা-বোনোর কথা। দুই লক্ষ নির্যাতিতা মা বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে আছে, যাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়েছে পাকিস্তানী দস্যুরা- যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করে, 'মুসলিম বাংলা' বলে চীৎকার করে। লজ্জা করে না। দুই লক্ষ মা-বোনোর কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোন দেশ কোন যুগে আজ পর্যন্ত এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। দেশের কী অবস্থা ছিল, জনসাধারণ জানে। কয় পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রা ছিল, সকলই জানা আছে। রাস্তাঘাটের কী অবস্থা ছিল, সবই আপনারা জানেন। চাউলের গুদামে কত চাউল ছিল, এ সবই আপনাদের জানা আছে।

মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনী মাত্র ছিল। শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী মাল বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায় এবং যাবার বেলায় গর্ব করে বলে যায় যে, স্বাধীনতা পেল বাঙ্গালী, কিন্তু এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে এবং আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ মাজা টান করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পীকার সাহেব, নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেয়া সহজ কথা নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হল, আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী। জনগণের উপর আস্থা রেখেই আমরা পাকিস্তানী সামরিক


www.pathagar.com

বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালবাসি।

সেইজন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর আমরা চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের গণভোটে গিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালবাসে। কিন্তু তা আমরা চাইনি, জনাব স্পীকার সাহেব- চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছিলাম এবং এই জন্যই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীদের একজনও আপত্তি করে বলেন নাই যে, আমরা এসেম্বলি ফরংংড়ষাব করব না। এজন্য আমি গর্বিত। আমার দলের সহকর্মীদের জন্য, মেম্বারদের জন্য আমি গর্বিত।

যারা এই এসেম্বলির মেম্বার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যারা এই গণপরিষদ সদস্য, তারা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। কেননা, কনভেনশনে তাই রয়েছে, রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করি নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, তার একটি প্রমাণ, আজ তারা শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং তারা নির্বাচনে যাবে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মী সকলেই প্রায় বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন 'অপোজিশনে' ছিলেন, বা দুইজন স্বতন্ত্র ছিলেন, তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে বেশী সুযোগ দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন। তাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। জনগণই ঠিক করে দেবে। আমাদের ভালবাসা রয়েছে– জনগণের উপরই নির্ভর করব।

নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হল আর একটি নতুন সৃষ্টি। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। আর,


www.pathagar.com

আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই বা কেউ এসে আমাদের মার্শাল ল' জারী করে বসিয়ে দেন নাই।

'মার্শাল ল' জারী আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা পারতেন, emergency! No democracy! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোন সমালোচনা চলবে না! কোন কথা বলা চলবে না! কোন মিছিল হবে না! কোন পার্টির কাম চলবে না! কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা করা যেত। সব দেশে, সব যুগে, বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ।

কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, তাহলে আমি তা স্বীকার করিনা। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির মূল উৎস হল জনগণ।

জনাব স্পীকার সাহেব, চারটা স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। অন্য সদস্যরাও এর উপর বক্তৃতা করেছেন।

এই যে চারটা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হল, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূল বিধি। মূল চারটা স্তম্ভ, জনগণ ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়–৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, অধিকার আছে অনেক কথা বলার। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙ্গালী জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি।

এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকল কিছুর সঙ্গে


www.pathagar.com

একট–সেটা হল অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোন জাতি বড় হতে পারে না এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক-জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে– তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর।

সেজন্য আজ বাঙ্গালী জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা নিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি। যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙ্গালী, আমার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে যদি কেউ আজকে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানি করে আগুন নিয়ে খেলবেন না।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে গণতন্ত্র যে, সব দেশে গণতন্ত্র চলেছে দেখা যায় সে সব দেশে পুঁজিপতিদের protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হল, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যে সব provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ protection পায় তার জন্য বন্দোবস্ত আছে- ঐ শোষকরা যাতে protection পায়, তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক schedule এ রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন।

অনেক আলোচনা হয়েছে, যে কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইনস্সিওরেন্স কোম্পানী, কাপড়ের কল, জুট মিল, সুগার ইন্ডাস্ট্রি–সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি, তার মানে হল শোষক গোষ্ঠি যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার


www.pathagar.com

করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানের গণতন্ত্রের, আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয় socialism- সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হল না, তাঁদের আগে বুঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কী।

সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্র বুঝতে পারে নাই। সমাজতন্ত্র গাছের ফল না- অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুরও হয়। সেই পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়।

সেজন্য পহেলা step যাকে প্রথম step বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ, এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্রের মূল কথা হল শোষণহীন সমাজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা সব কিছু বিবেচনা করে step by step, এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রে দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে।

রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই– সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পার্শ্বে বাস করেও যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাদের দেশের environment নিয়ে, তাদের জাতির background দিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্য পথে এসেছে। মধ্য প্রাচ্যে যান– ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্য দিকে চলেছে।

বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না, তা যাঁরা করেছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র করতে পারেন নাই। কারণ, লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না– যেমন আন্দোলন হয় না।

সেজন্য দেশের environment, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের কাস্টম, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়,


www.pathagar.com

দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে socialism করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই- আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তার পরে আসছে ধর্মনিরপেক্ষতা। জনাব স্পীকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে- তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে- কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে–তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না। খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে–কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যভিচার– এই বাংলাদেশের মাটিতে এ সব চলেছে।

ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।

যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

কেউ যদি বলে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে।

কোন কোন বন্ধু বলেছেন, Schedule -এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পীকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না– ভবিষৎ বংশধর, ভবিষৎ জনসাধারণ কেমন করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের Success, কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি।


www.pathagar.com

কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারী কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোন different class নয়।

ইংরেজ আমলে I.C.S, I.P.S. দের protection দেওয়া হত। সেই protection পাকিস্তান আমলেও দেওয়া হত। আমলাতন্ত্রের সেই protection-এর উপর আঘাত করেছি– অন্য জায়গায় আঘাত করিনি। এই class রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, classless society প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। দিনমজুর, কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশী অধিকার তাঁরা পেতে পারে না।

সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন– তাঁরা সেবক।

Some people came to me and wanted protection from me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen."

আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি।

কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে? মাত্র কয়েজনের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরও বেশী কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নিতে হতে পারে।

আজ যে কাজ করবে, লোক তাকে কত ভালবাসে, তার উপর নির্ভর করবে তার promotion। Promotion -এর ব্যাপারে গরীব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার থাকবে। গরীব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরীব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে।


www.pathagar.com

আমার Services Reorganisation Committee করেছি। সেই কমিটির মেম্বারদের বলেছি, ডঃ কামাল হোসেনও বলেছেন, Central Government-এর ১২৫ step বা Provincial Government-এর 33 step আমরা রাখব না। এই ১২৫ এবং 33 step-এর মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে অনেক promotion হত। সাত আসমান। এর বেশী step সরকারী চাকুরীতে থাকবে না। মাত্র ৭ step থাকবে।

এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে ফুসফাস করছে এবং M.C.A. দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি। আমরা এহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমগা' নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, এহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই protection পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের খতম কর, action নিলে তাঁরাই আবার মিটিং করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিস Collaborator-এ ভরে গিয়েছে। Collaborator আছে। যাদের সম্বন্ধে definite খবর পাই, তাদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়।

তারপর, কাজ না করে চেয়ার টেবিলে বসে থাকা, এটা একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed। ঐ C.S.P., P.S.P. বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারী চাকুরীতে ৭ step থাকবে। Services Reorganisation Committee করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সব কিছু করা হবে। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তাঁরা আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিনান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে।

Scrutiny Committee করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে।


www.pathagar.com

Pay Commission করা হয়েছে। সেটাকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা পাবে কেউ ২ হাজার পাবে-- তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সব কিছু পাবে, আর একজন পাবে না-- তা হতে পারে না। Pay Commission সরকারি কর্মচারীদের highest and lowest pay ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। এ রকম কোন পার্টি আছে কিনা, জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোন পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায়, তাহলে সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুক, আমরা বিরোধী-দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী-দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক, আমরা বিরোধী-দল। তা না হলে বলুক, এই এই আমাদের দাবী।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য Ethics হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না।

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেল সেতু নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যারা opposition করছেন, যান না রিলিফ কমিটি করে, চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, তাহলেও বুঝি। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠবার জন্য বক্তৃতা করে 'গণতন্ত্র চাই' বললে কী হবে।

গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও রয়েছে। আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেইজন্য স্পীকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে।

জনগণের দাবীর মধ্যে আছে ভোটের দাবী। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়স সীমা ছিল ২১ বৎসর- আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর


www.pathagar.com

করেছি। এটাও জনগণের দাবীর মধ্যে একটা।

আমরা শাসনতন্ত্র এনেছি। এর উপর আইন পাস হবে, যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভাইয়েরা ভুল করছেন- শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোন সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিষ, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে। সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন করতে হয়। অনেকে ভুল করেছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝাবার মতো আক্কেল নাই, তাই বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। কারও আবার মগজ নাই।

শাসনতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই fundamental-এর উপর ভবিষ্যৎ এ্যাসেম্বলীতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক আইনের বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না।

শাসনতন্ত্রের মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী, সেইসব শোষককে curtail করা হবে।

শোষকদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার দাবীও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই, সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করব, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে।

সাধারণভাবে যারা দোষী যারা collaboration করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারীর কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয় মুক্তি পাবে।

যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিতও নয়। কারণ, প্রকাশ্যে গাড়ী দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারীকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে মিলিটারীর কাছে


www.pathagar.com

দিয়েছে। নানভাবে তারা collaboration করেছে।

স্পীকার সাহেব, এই এ্যাসেম্বলীর যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন, তার আশেপাশে এবং এই এ্যাসেম্বলীর এমন কোন দেওয়াল নাই, যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভার সেই সব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেওয়ালের সেই সব দাগ দেখেছেন কিনা, জানি না। এই পরিষদের যাঁরা কর্মচারী আছেন, তাঁরা নিশ্চয় বলবেন, এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায়, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের দাগ ছিল। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেওয়ালের গায়ে জয় বাংলা লিখে গিয়েছে। এই এ্যাসেম্বলীর হলের মধ্যে collaborator-দের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে।

নিরপরাধ যাঁরা থাকবেন, তাঁদের খালাস দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের-- যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের seat খালি করিয়ে, আচকান গায়ে দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের বাংলাদেশের নাগরিক-অধিকার দেওয়াতেও জনগণ আপত্তি করেছিল। জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।

যাই হোক আমরা সংবিধানের Schedule-এ যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা protection দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না হলে litigation করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলিকে protection দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই তৃতীয়াংশ majority-র প্রয়োজন হবে। কতকগুলি শুধু majority-তেই পরিবর্তন করা যাবে । এই প্রকার differnce না রাখলে অসুবিধা হবে।

মানতে হয়। খবরের কাগজে journalism করতে হলে ethics মানতে

জনাব, স্পীকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেইদিন, যেদিন জল্লাদবাহিনী রেস্‌কোর্স-ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্র বাহিনীর যৌথ কম্যান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল সেই তারিখ। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পীকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই।


www.pathagar.com

আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মূলতবী করতে পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে original সংবিধানে দস্তখত করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলার হাতে লেখা হচ্ছে। তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত করবেন।

১৪ এবং ১৫ তারিখের পর ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পীকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই। আমি ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ নিদিষ্ট করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে। কারণ সেই দিন সেই ৭ই মার্চে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করেছিলামঃ "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই দিন সেই ৭ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন বলে আমি চীফ ইলেকশন কমিশনারকে আবেদন করব।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার ধৈর্য নষ্ট করতি চাই না–আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় ছিলাম। আপনাকেসহ কর্মচারীদের যাঁরা এই কষ্টের ভিতর বাইরে ডিউটি করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই-তাঁরা কর্তব্যপরায়ণ তার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি খবরের কাগজকে কিছু না বলি, তাহলে আবার মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলি, আপনারা এত কষ্ট করেছেন, এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন জায়গা আপনাদের ভালভাবে দিতে পারি নাই বসবার জন্য, এই কষ্টের মধ্যেও যে এত ভালভাবে এ্যাসেম্বলী থেকে শাসনতন্ত্রের প্রসিডিঙ্গের রিপোর্ট করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ আপনাদের। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট করবেন। কারণ, নতুন এ্যাসেম্বলীতে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমাদেরও নাই। আর দেশবাসী যখন কষ্ট করছে, তখন তার কিছু ভাগ নেওয়া উচিত।

জনাব স্পীকার সাহেব, এই হাউসের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পীকার পেছনে বসে আছেন তাঁকে ধন্যবাদ না জানালে অন্যায় হবে।


www.pathagar.com

তারপর যারা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে এই সংবিধানে জন্য দু'তিন বার কওে কাজ করতে হয়েছে তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন মেম্বারকে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ১১ই এপ্রিল তারিখ থেকে। সেদিন এই সংবিধান কমিটি আমরা করি।

তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত নির্বিশেষে আপনাদের যে কোন পরামর্শ যে কোন মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যদিও দু একটি কেউ কেউ দিয়েছেন কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। তাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, অন্য কর্মীদের কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে, প্রফেসারের কাছ থেকে আরও অনেক পেয়েছি। তাতে অনেক সাহায্য হয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যাঁরা মানেন না, যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, তাঁরা মেহেরবানি করে এক কলম লিখে পাঠাননি। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। জাত যায় না ম'লে, খাসলত যায় না ধুলে।

জনাব স্পীকার, আমার বক্তৃব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের সেই বিপদের কথা, যে সব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। তার চেয়ে বড় কথা আমার জীবনের আজকে সবচেয়ে আনন্দের দিন-সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালিত হল। এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোন ভাল জিনিস না দেখলে, না গ্রহণ করলে, না ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না।

ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদের রক্তদান সার্থক হবে।

আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, জনাব স্পীকার। আজকে বিদায় নেওয়া হচ্ছে। তবে সদস্যরা আবার সংবিধানে স্বাক্ষর করতে আসবেন। তারপর, যাঁরা পাঁচ বছরের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা সেই পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ না হতেই চলে যাবেন। এইভাবে তাঁরা যে ত্যাগের প্রমাণ দিলেন, উদারতা দেখালেন, সেটা পার্লামেন্টের ইতিহাসে বিরল। এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

**ড. কামাল হোসেন :** মাননীয় স্পীকার, নেতার বলার পর আমার আর বলার কিছুই নেই। গণপরিষদের সামনে এই যে প্রস্তাবটা আছে, সেটা


www.pathagar.com

গৃহীত হলে আমার দায়িত্বও আপাততঃ শেষ হবে। আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই সকলকে। বিশেষতঃ নেতার কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছি, তা ভুলবার নয়, যার ফলে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়েছে এবং অল্প দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই, মাননীয় সদস্যদের বিশেষ করে আমার সঙ্গে সংবিধান রচনা করতে গিয়ে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদেরকে। যখনই, যে কোন সময়ে ডাক দিয়েছি, তাঁদের পেয়েছি। মাননীয় স্পীকার, পরিষদে সদস্যদের আলোচনার জন্যও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নির্দলীয় সদস্যদেরকে এবং মাননীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে তাঁদের সহযোগিতা না পেলে এত সুন্দরভাবে অগ্রসর হওয়া যেত না।

আরও ধন্যবাদ জানাব সচিবালয়ের কর্মচারীদের, যাঁদের আমরা সব সময় কাজের জন্য কাছে পেয়েছি।

এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাব আইন মন্ত্রণালয়ের যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, কাজ করেছেন, তাদেরকে-তাঁরা যদিও পদার অন্তরালে কাজ করেছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা জানাব ভাষা বিশেষজ্ঞদের, যাঁরা অগাধ পরিশ্রম করে এ কাজে, সংবিধানের কাজে সাহায্য করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে এবং জনাব ডেপুটি স্পীকারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

জনাব স্পীকার, আজকে এই সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ এক মহান শপথ গ্রহণ করেছে যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। আজকে সারা জাতি এই শপথ গ্রহণ করেছে এই গণপরিষদে। এই শপথ গ্রহণ করার অর্থ হল একটা মহান দায়িত্ব গ্রহণ করা।

আমি সর্বশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করব, যেন এই দায়িত্ব আমরা সুচারুরূপে পালন করতে পারি।

যে শহীদেরা আত্মাহুতি দিয়েছেন এ দেশের স্বাধীনতার জন্য, তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছেন শোষণমুক্ত সমাজের, আজকে বাংলাদেশের জনগণ আশা করে, যে সংবিধান কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তার মাধ্যমেই হবে তার উপযুক্ত


www.pathagar.com

বাস্তবায়ন।

আমি আল্লাহর নিকট আবার প্রার্থনা করি, যেন বাংলাদেশের জনগণের আশা পূর্ণ হয়।

পরিশেষে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বলতে চাই যে, আমার নামে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তা এখন গণপরিষদের ভোটে দেওয়া হোক।

**জনাব স্পীকার :** এখন পরিষদের সম্মুখে প্রশ্ন হলঃ

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি সংবিধান প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিষদে স্থিরীকৃত আকারে সংবিধান বিলটি গ্রহণ করা হোক।" যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা 'হাঁ' বলুন [ধ্বনি ভোট গ্রহণের পর]

আর, যাঁরা এর বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলুন। [ধ্বনি ভোট গ্রহণের পর]

আমার মনে হয়, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, প্রস্তাবনাটি গৃহীত হল এবং পরিষদে স্থিরীকৃত আকারে সংবিধান বিল পাস হল।

**ড. কামাল হোসেন :** মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে, "বিলের প্রস্তাবনা সংক্ষিপ্ত শিরনামা, সূচীপত্র, তফসীল, সকল অনুচ্ছেদ, দফা, উপ-দফা, বিষয়বস্তু সংবিধান বিলের অংশ বলে গৃহীত হোক।"

**জনাব স্পীকার :** উত্থাপিত প্রস্তাব হচ্ছে "বিলের প্রস্তাবনা সংক্ষিপ্ত শিরনামা, সূচীপত্র, তফসীল, সকল অনুচ্ছেদ, দফা, উপ-দফা, বিষয়বস্তু সংবিধান বিলের অংশ বলে গৃহীত হোক।"

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা 'হাঁ' বলুন। [ধ্বনি ভোট গ্রহণের পর]

এবং যাঁরা এর বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলুন। [ধ্বনি ভোট গ্রহণের পর]

আমার মনে হয়, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান :** জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মওলানা তর্কবাগীশ সাহেব মোনাজাত করে দোয়া করবেন।

**জনাব স্পীকার :** মাননীয় সদস্যা ও সদস্যবৃন্দ, আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে দুই চারটি কথা বলতে চাচ্ছি।

আপনারা যে সহযোগিতা আমার সঙ্গে করেছেন তার জন্যই আমি আমার বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছি। আপনারা জানেন, কত সংক্ষিপ্ত


www.pathagar.com

সময়ের মধ্যে আমাদেরকে কাজ শেষ করতে হয়েছে।
আপনারা সকলেই সুবক্তা। কিন্তু যথেষ্ট সময়ের অভাবে আমি আপনাদের সময় দিতে পারি নাই। এবং আমার কোন সিদ্ধান্তে যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করেবেন।
আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের পরিষদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি সহযোগিতা করেবেন। সেই সহযোগিতা পেয়েছি বলেই আমি এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছি।
আমি ধন্যবাদ জানাই এই পরিষদের ন্যাপদলীয় সদস্য শ্রী সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তকে এবং নিদর্লীয় নেতাদেরকে। তাঁরা নিজেদের কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছেন। বিশেষ করে শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত তার দলের জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার ভুমিকা পালন করেছেন।
আমি ধন্যবাদ জানাই সাংবাদিক ভাইদের। তাঁরা যে সহযোগিতা এবং সাহায্য আমাদের করেছেন, তার জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
আমি ধন্যবাদ জানাই পরিষদ কর্মচারীদের তাদের। তাদের অকৃত্রিম পরিশ্রমের ফলে পরিষদের কার্য সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়েছে।
আমি আবার সকল সদস্যা ও সদস্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
এখন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ দোয়া করবেন। তার পর এই পরিষদ মুলতবী ঘোষণা করা হবে।
[অতঃপর প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়]
**জনাব স্পীকার :** মাননীয় সদস্যা ও সদস্যবৃন্দ, গণপরিষদের অধিবেশন আগামী ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ৯ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

[অতঃপর অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়][১১]
খসড়া সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৮২টি অনুচ্ছেদে কোনো সংশোধনী ছিলনা। ১২টি অনুচ্ছেদের ওপর আনা সংশোধনী আলোচনার পর গণপরিষদে নাকচ হয়। ৬টি অনুচ্ছেদের ওপর প্রদত্ত সংশোধনী বিধিবর্হিভূত বলে স্পিকার ঘোষণা করেন। ৩টি অনুচ্ছেদের ওপর আনা সংশোধনী উত্থাপিত হয়নি। অবশিষ্ট ৫০টি অনুচ্ছেদে মোট ৬২টি সংশোধনী, সংবিধানের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলে একটি করে দু'টি, তৃতীয় তফসিলে দু'টি, চতুর্থ তফসিলে ষোলটি এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি–সব মিলিয়ে ৮৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়।[১২]

১৯৭২ সালের ১২ ডিসেম্বর গণভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের শিল্পীবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল দেখা করেন। জয়নুল আবেদিন হাতে লেখা


www.pathagar.com

সংবিধানের অনুলিপিটির প্রতিটি পাতায় অঙ্কিত চিত্রগুলো বঙ্গবন্ধুর কাছে উপস্থাপন করেন। লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং একজন প্রখ্যাত পেশাদার লিপিকর একেএম আবদুর রউফকে সংবিধান হাতে লেখার জন্য বিশেষভাবে লন্ডন থেকে নিয়ে আসা হয় এবং তার ওপর এই দায়িত্ব দেয়া হয়।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের অষ্টাদশ বৈঠক ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা ১০ মিনিটে স্পীকার মুহম্মদুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকাস্থ পরিষদ ভবনে শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতেই সংবিধান কমিটির সভাপতি এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, "গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে এই গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধান গৃহীত হয়েছে, সদস্যরা আজ তাতে স্বাক্ষর-দান করতে পারবেন বলে আমরা খুবই আনন্দবোধ করছি। কিন্তু যে অসংখ্য শহীদ স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, তাঁদের কথা স্মরণ করলে এই আনন্দ ম্লান হয়ে যায় এক গভীর শোকের ছায়ায়। আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ছে এক বছর আগেকার এই দিনের কথা, যখন দেশ মুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পরাজিত দখলদার বাহিনী আর তার সহযোগীরা আমাদের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। আজ আমাদের সান্ত্বনা শুধু এইটুকু যে, সেই সব শহীদের বিদেহী আত্মা আমাদের আজকের গর্ব আনন্দের শরিক। জনাব স্পীকার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এখন প্রস্তাব করছি যে, সকল সংশোধনী ও লেখনীগত ত্রুটির শুদ্ধি অর্ন্তভূক্ত করার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল পাঠ বাংলা এবং ইংরেজীতে অনূদিত একটি অনুমোদিত পাঠ এখন স্পীকার কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলে সার্টিফিকেট প্রদান করা হোক এবং গণপরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক সংবিধান ও তার ইংরেজী অনুবাদের স্বাক্ষরিত একটি করে পাঠ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত করা হোক।" এরপর ধ্বনি-ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে স্পীকার দিনের কার্যসূচির দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ স্বাক্ষর-দান অনুষ্ঠান শুরু করেন। এ-পর্যায়ে মাননীয় স্পীকার বলেন, "মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের স্বাক্ষর উৎসব শুরু হবে। আপনারা যার যার আসনে আছেন, সেই ক্রমানুসারে এক এক করে এসে আমাদের রিপোর্টারগণ যে টেবিলে বসে লেখেন, সেই টেবিলে রক্ষিত সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজী পাঠে স্বাক্ষর-দান করুন। এক নম্বর আসনে রয়েছেন পরিষদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে আমি প্রথমে স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান করছি।" তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে সংবিধানের বাংলা এবং পরে ইংরেজী পাঠে স্বাক্ষর-দান করেন। ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পরিষদ নেতা বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার পর স্পীকার বাংলাদেশ গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায় অনুযায়ী জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে রাত বারোটায় পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।[১৩]


www.pathagar.com

প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর পরিষদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। এরপর মন্ত্রিসভার সদস্যগনকে এবং পরিষদ কক্ষে সদস্যগণের আসনের ক্রমিক নম্বর অনুসারে সদস্যবৃন্দকে স্পীকার একে একে সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি পাঠে স্বাক্ষর দেয়ার আহবান করেন। সংবিধানে স্বাক্ষরের এ প্রক্রিয়া ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর শেষ হয়। সংবিধানে স্বাক্ষরের সময় গণপরিষদে ৪০৩ জন সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে ৩৯৯ জন সদস্য সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। এই ৩৯৯ জন সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত সংবিধানের মূল বাংলা পাঠ ও অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ গণপরিষদে গৃহীত পূর্বোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। গণপরিষদেরও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সংবিধানে স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠানের শেষ দিন অর্থ্যাৎ ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েকজন সদস্য সংবিধানে স্বাক্ষর দিতে পারেন নি বা করেন নি।[১৪] মো. আজিজার রহমান (পিই ২২, রংপুর-২২), শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (পিই ২২১ সিলেট-২), জালাল আহমদ (পিই ২৫৯ কুমিল্লা-৯) এবং শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (পিই ২৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন নি।[১৫]

পরের দিন ১৬ই ডিসেম্বর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়। সংবিধান বলবৎ হওয়াকে সংবিধানে 'সংবিধান প্রবর্তন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১,২,৩,১২,১৪,১৫] *সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি: খোন্দকার আবদুল হক*

[৪] *এই ছয় জন হলেন- আছাদুজ্জামান খান, একে মোশাররফ হোসেন আখন্দ, আবদুল মুত্তকাকীম চৌধুরী, হাফিজ হাবিবুর রহমান, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল।*

[৫, ৭, ৮, ৯, ১৩] *গণপরিষদ কার্যক্রম সম্পর্কে ২০১০ সালে দৈনিক জনকণ্ঠে আবুল খায়েরের লেখা নিবন্ধ*

[৬] *গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন শাহ আবদুল হামিদ ও মুহম্মদুল্লাহ। স্পিকার শাহ আবদুল হামিদ ১৯৭২ সালের ১লা মে মৃত্যুবরণ করলে ডেপুটি স্পিকার মুহম্মদুল্লাহ স্পিকার নির্বাচিত হন। পরে মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।*

[১০, ১১] *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক, সরকারি বিবরণী, ১৯৭২।*

• লেখক : সাধারণ সম্পাদক, ল' রিপোর্টার্স ফোরাম এবং বিশেষ প্রতিনিধি, এটিএন নিউজ



www.pathagar.com

**MD. TAFAZZUL ISLAM, CJ:-**

...

Upon hearing the parties, the High Court Division made the Rule absolute and at the end of its judgment the High Court Division summarized its findings as follows:-

1. Bangladesh is a Sovereign Democratic Re public, governed by the Government of laws and not of men.
2. The Constitution of Bangladesh being the embodiment of the will of the Sovereign People of the Republic of Bangladesh, Is the supreme law and all other laws, actions and proceedings, must conform to it and any law or action or proceeding, In whatever form and manner, if made in violation of the Constitution, is void and non est.
3. The Legislature, the Executive and the Judiciary being the three pillars of the Republic created by the Constitution, as such, are bound by its provisions. The Legislature makes the law, the Executive runs the government in accordance with law and the Judiciary ensures the enforcement of the provisions of the Constitution.
4. All functionaries of the Republic and all services of the Republic, namely, Civil Service, Defence Service and all other services, owe its existence to the Constitution and must obey its edicts.
5. State of emergency can only be declared by the President of the Republic on the advice of the Prime Minister, in case of imminent danger to the security or economic life of the Republic.
6. The Constitution stipulates a democratic Republic, run by the elected representatives of the People of Bangladesh and any attempt by any person or group of persons, how high so ever, to usrup an elected government, shall render themselves liable for high treason.
7. A proclamation can be issued to declare an existing law under the Constitution, but not for promulgating a new law or offence or for any other purpose.
8. There is no such law in Bangladesh as Martial Law and there in also no such authority as Martial Law Authority as such and if any person declares Martial Law, he will be liable for high treason against the Republic. Obedience to superior orders is itself no defence.
9. The taking over of the powers of the Government of the People's Republic of Bangladesh with effect from the morning of 15th August, 1975, by Khandaker Mushtaque Ahmed, an usurper, placing Bangladesh under Martial Law and his assumption of the office of the President of Bangladesh, were in clear violation of the Constitution, as such, illegal, without lawful authority and without jurisdiction.
10. The nomination of Mr. Justice Abusadat Mohammad Sayem, as the President of Bangladesh, on November,6, 1975, and his taking



www.pathagar.com

over of the Office of President of Bangladesh and his assumption of powers of the Chief Martial Law Administrator and his appointment of the Deputy Chief Martial Law Administrators by the Proclamation issued on November 8,1975, were all in violation of the Constitution.

11. The handing over of the Office of Martial Law Administrator to Major General Ziaur Rahman B.U., by the aforesaid Justice Abusadat Mohammad Sayem, by the Third Proclamation issued on November 29,1976, enabling the said Major General Ziaur Rahman, to exercise all the powers of the Chief Martial Law Administrator, was beyond the ambit of the Constitution.

12. The nomination of Major General Ziaur Rahman, B.U., to become the President of Bangladesh by Justice Abusadat Mohammad Sayem, the assumption of office of the President of Bangladesh by Major General Ziaur Rahman, B.U., were without lawful authority and without jurisdiction.

13. The Referendum Order, 1977 (Martial Law Order No.1 of 1977),published in Bangladesh Gazette On 1st May, 1977, is unknown to the Constitution, being made only to ascertain the confidence of the people of Bangladesh in one person, namely, Major General Ziaur Rahgman, B.U.

14. All Proclamations, Martial Law Regulations and Martial Law Orders made during the period from August 15, 1975 to April 9,1979, were illegal, void and non est because.

Those were made by persons without lawful authority, as such, without jurisdiction.

ii) The Constitution was made subordinate and subservient to those Proclamations, Martial Law Regulations and Martial Law Orders,

iii) Those provisions disgraced the Constitution which is the embodiment of the will of the people of Bangladesh, as such, disgraced the people of Bangladesh also.

From August 15, 1975 to April 7, 1979 Bangladesh was ruled not by the representatives of the people but by the usurpers and dictators, as such, during the said period the people and their country, the Republic of Bangladesh, lost its sovereign republic character and was under the subjugation of the dictators.

From November 1975 to March, 1979 Bangladesh was without any Parliament and was ruled by the dictators, as such, lost its democratic character for the said period.

The Proclamations etc. destroyed the basic character of the Constitution, such as, change of the secular character, negation of Bangalee nationalism, negation of Rule of law, ouster of the jurisdiction of Court, denial of those constitute seditious offence.

15. Paragraph 3A was illegal,

"Firstly because it sought to validate the Proclamations, MLRs and MLOs which were illegal", and "Secondly, Paragraph 3A, made by the Proclamation Orders, as such, itself was void".



www.pathagar.com

16. The Parliament may enact any law but subject to the Constitution. The Constitution (Fifth Amendment) Act, 1979 is ultra vires, because:

Firstly, Section 2 of the Constitution (Fifth Amendment) Act, 1979, enacted Paragraph 18, for its insertion in the Fourth Schedule to the Constitution, in order to ratify, confirm and validate the Proclamations, MLRs and MLOs etc. during the period from August 15, 1975 to April 9, 1979. Since those Proclamations, MLRs, MLOs etc., were illegal and void, there were nothing for the Parliament to ratify, confirm and validate.

Secondly, the Proclamations etc. being illegal and constituting offence, its ratification, confirmation and validation, by the Parliament were against common right and reason.

Thirdly, the Constitution was made subordinate and subservient to the Proclamations etc.

Fourthly, those Proclamations etc. destroyed its basic features.

Fifthly, ratification, confirmation and validation do not come within the ambit of 'amendment' in Article 142 of the Constitution.

Sixthly, lack of long title which is a mandatory condition for amendment, made the amendment void.

Seventhly, the Fifth Amendment was made for a collateral purpose which constituted a fraud upon the People of Bangladesh and its Constitution.

...

Regarding condonation, the High Court Division, in paragraphs 18-21 of the summary, held as follows:-

"18. The turmoil or crisis in the country is no excuse for any violation of the constitution or its deviation on any pretext. Such turmoil or crisis must be faced and quelled within the ambit of the Constitution and the laws made thereunder, by the concerned authorities, established under the law for such purpose.

19. Violation of the Constitution is a grave legal wrong and remains so for all time to come. It cannot be legitimized and shall remain illegitimate for ever, however, on the necessary of the State only, such legal wrongs can be condoned in certain circumstances, invoking the maxims. Id quod Alias Non Est Licitum. Necessitas Licitum Facit, salus populi est suprema lex and salus republicae est suprema lex.

20. As such, all acts and things done and actions and proceedings taken during the period from August 15, 1975 to April 9, 1979, are condoned as past and closed transactions, but such condonations are made not because those are legal but only in the interest of the Republic in order to avoid chaos and confusion in the society, although distantly apprehended, however, those remain illegitimate and void forever.

21. Condonations of provisions were made, among others, in respect of provisions, deleting the various provisions of the Fourth Amendment but no condonation of the provisions was allowed in



www.pathagar.com

respect of omission of any provision enshrined in the original Constitution. The Preamble Article 6, 8, 9, 10, 12, 25, 38 and 142 remain as it was in the original Constitution. No condonation is allowed in respect of change of any of these provisions of the Constitution. Besides, Article 95, as amended by the Second Proclamation Order No. IV of 1976, is declared valid and retained."

We are of the view that in the spirit of the Preamble and also Article 7 of the Constitution the Military Rule, direct or indirect, is to be shunned once for all. Let it be made clear that Military Rule was wrongly justified in the past and it ought not to be justified in future on any ground, principle, doctrine or theory whatsoever as the same is against the dignity, honour and glory of the nation that it achieved after great sacrifice; it is against the dignity and honour of the people of Bangladesh who are committed to uphold the sovereignty and integrity of the nation by all means; it is also against the honour of each and every soldier of the Armed Forces who are oath bound to bear true faith and allegiance to Bangladesh and uphold the Constitution which embodies the will of the people, honestly and faithfully to serve Bangladesh in their respective services and also see that the Constitution is upheld, it is not kept in suspension, abrogated, it is not subverted, it is not mutilated, and to say the least it is not held in abeyance and it is not amended by any authority not competent to do so under the Constitution.

Accordingly though the petitions involve Constitutional issues, leave, as prayed for, can not be granted as the points raised in the leave petitions have been authoritatively decided by superior Courts as have been reflected in the judgment of the High Court Division.

We, therefore, sum up as under:

1. Both the leave petitions are dismissed;

2. The judgment of the High Court Division is approved subject to the following modifications:-

(a) All the findings and observations in respect of Article 150 and the Fourth Schedule in the judgment of the High Court Division are hereby expunged, and the validation of Article 95 is not approved;

3. In respect of condonation made by the High Court Division, the following modification is made and condonations are made as under:

(a) all executive acts, things and deeds done and actions taken during the period from 15th August 1975 to 9th April, 1979 which are past and closed;

(b) the actions not derogatory to the rights of the citizens;

(c) all acts during that period which tend to advance or promote the welfare of the people;

(d) all routine works done during the above period which even the lawful government could have done.

(e) (i) the Proclamation dated 8th November, 1975 so far it relates to omitting Part VIA of the Constitution;

(ii) the Proclamations (Amendment) Order 1977 (Proclamations


www.pathagar.com

Order No. 1 of 1977) relating to Article 6 of the Constitution.

(iii) the Second Proclamation (Seventh Amendment) Order, 1976 (Second Proclamation Order No. IV of 1976) and the Second Proclamation (Tenth Amendment) Order, 1977 (Second Proclamation Order No. 1 of 1977) so far it relates to amendment of English text of Article 44 of the Constitution;

(iv) the Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No.IV of 1978) so far it relates to substituting Bengali text of Article 44;

(v) The Second Proclamation (Tenth Amendment) Order, 1977 (Second Proclamation Order No. 1 of 1977) so far it relates to inserting Clauses (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of Article 96 i.e. provisions relating to Supreme Judicial Council and also clause (1) of Article 102 of the Constitution, and

(f) all acts and legislative measures which are in accordance with, or could have been made under the original Constitution.

While dismissing the leave petitions we are putting on record our total disapproval of Martial Law and suspension of the Constitution or any part thereof in any form. The perpetrators of such illegalities should also be suitably punished and condemned so that in future no adventurist, no usurper, would dare to defy the people, their Constitution, their Government, established by them with their consent. However, it is the Parliament which can make law in this regard. Let us bid farewell to all kinds of extra constitutional adventure for ever.

**Source:** Supreme Court of Bangladesh's website

## সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়

(উল্লেখযোগ্য অংশ)

**A.B.M. KHAIRUL HAQUE, C.J. :-**

...

৪৩। উপসংহার ঃ

উপরের দীর্ঘ আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে জনগণের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক চরিত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে সংবিধানের Basic Structure ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে যে কোন সংশোধন আইনই সংসদ প্রণয়ন করিতে ক্ষমতাবান বটে; কিন্তু রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বা Basic Structure খর্ব বা ক্ষুণ্ন করে এমন কোন সংশোধনী সংসদ ইহার সংশোধনী ক্ষমতাবলে করিতে পারে না। ঐ সংশোধন সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে আনয়ন করা হইলে সুপ্রীম কোর্ট বলিবে "It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is." (John Marshall)।

কোন অজুহাতেই এবং তর্কিত বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়, শত আইনজীবির এইরূপ বক্তব্য সত্ত্বেও তর্কিত আইনে যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবার প্রশ্ন থাকে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টই ইহার দায়িত্ব স্থির করিবে "We have no more right to decline the exercise of jurisdiction which is given, than to usurp that which is not given. The one or the other would be treason to the constitution." (John Marshall).



www.pathagar.com

উপরে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। উক্ত আইনটি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি জনগণের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পরিচয় ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করিয়াছে বিধায় ইহা অসাংবিধানিক তথা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহা আইন নয়।

...

আইনগত এই অবস্থানের প্রেক্ষাপটে এবং সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদের অধীনে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচারের জন্য (for doing complete justice) সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, আইনটি ভাবীসাপেক্ষ ভাবে (Prospectively) ২০১১ সালের ১০ই মে তারিখ হইতে অবৈধ ঘোষণা করা হইল। ...

এই ব্যাপারে দুইটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, যাহা প্রয়োজন তাহা হইল কারচুপিহীন একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সেইজন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন (autonomous) নির্বাচন কমিশন, কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নহে। কারণ, দ্বিতীয়ত, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি নির্বাচনের পূর্বে ও পরবর্তীতে নানা ধরনের চরম সঙ্কট দেখা দিয়াছে যাহা বহুল প্রচারিত ও বহুল প্রশংসিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে না। তাহাছাড়া, প্রতিবারই যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তাহারাই নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করিতে সরাসরি অস্বীকার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নির্বাচনের পূর্বেও রাজনৈতিক দলগুলি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নানাবিধ অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে। ইহা আর যাহাই হোক, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সাফল্যের পরিচয় বহন করে না।

উল্লেখ্য যে, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিশ্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে যদি প্রতীয়মান হয় যে একটি রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ করিয়া সরকার গঠন করে এবং পাঁচ বৎসর কাল রাষ্ট্র পরিচালনা করে, কিন্তু সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করিতে অপারগ। ইহা জাতির জন্য অপমানজনক। সরকারকে শুধু দেশ পরিচালনা নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। দেশের আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়নমুখী বিভিন্ন কাজও করিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, মেয়াদ মধ্যে অনেক উপ-নির্বাচনও হয়। সব কিছুই সরকার ইহার মেয়াদ মধ্যেই করিতে পারে, শুধুমাত্র পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে অপারগ করা হয়। নির্বাচন করিবার জন্য আর একটি অনির্বাচিত সরকার প্রয়োজন হয়। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। ইহা গণতন্ত্রের লজ্জা, এই প্রজাতন্ত্রের লজ্জা। বিশ্ব-রাষ্ট্রপুঞ্জের সমাজে এই ঘটনা আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করেই না, বরঞ্চ ইহা চরম অপমানজনক।

আশ্চর্য যে সেই অপমান উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও যেন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। উপরন্তু এই ব্যবস্থা পাঁচ বৎসর ব্যাপী জনপ্রতিনিধিদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বকে নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করিয়া তোলে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ধারণা আমরা সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া গর্ব করিয়া বোকার স্বর্গে বাস করি, অথচ পৃথিবীর অনেক দেশেই নির্বাচনে প্রবল কারচুপি হয়, সে সকল দেশের সংবাদ মাধ্যম ও প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্ট কঠোরতম ভাষায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ এমন কি সরকারকেও সমালোচনা করে বটে, কিন্তু প্রজাতান্ত্রিকতা বা গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠাইবার কথা তাহারা চিন্তাও করে না। বিচার বিভাগকে তাহারা সকল প্রশ্নের উর্ধে রাখে।

...

নির্বাচনে কারচুপি সম্বন্ধে বিজ্ঞ Amicus Curiae গণের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে চাই যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইহার সমাধান নহে। কারচুপিমুক্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন সত্যকার স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণের একান্ত ও নির্ভেজাল প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিকভাবে স্বাধীন করিতে হইবে। ইহাকে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। লোকবল নিয়োগে কোন প্রকার বাঁধা সৃষ্টি করা যাইবে না। নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে সর্বপ্রকার প্রয়োজন নিরসনকল্পে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ লইবেন।

সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল প্রকার সহায়তা সরকারের নির্বাহী বিভাগ ত্বরিত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, অন্যথায় তাহারা সংবিধান ভঙ্গ করিবার দায়ে দায়ী হইবেন। এই ব্যাপারে কোন তরফে কোন গাফিলতি দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে অভিযোগ উত্থাপন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ত্বরিত গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় তাহারাও সংবিধান ভঙ্গের দায়ে দায়ী হইবেন। সাধারণ নির্বাচনের তপসীল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা (discretion) অনুসারে, যাহারা এমনকি পরোক্ষ ভাবে জড়িত, রাষ্ট্রের সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। নির্বাচন কমিশনারগণ অর্ন্তমুখী (introvert) হইবেন না। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা (transparence) বজায় রাখিবেন। সতত মনে রাখিবেন যে জনগণের নিকটেই তাঁহাদের জবাবদিহিতা (accountability)। তাঁহারা সকলে জনগনের সেবক মাত্র।

তাঁহারা কি কাজ করিতেছেন তাহাও জনগণের জানিবার অধিকার রহিয়াছে, তাঁহারা কি কাজ করিতে পারিতেছেন না এবং কেন পারিতেছেন না তাহাও জানিবার অধিকার জনগনের রহিয়াছে। নির্বাচনী আইন বা বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনগত পদক্ষেপ তড়িৎ লইতে হইবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন চলিবে না। শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে নির্বাচন কমিশনের সংশিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্যকারী হইবেন।


www.pathagar.com

ইহা নিশ্চিত যে সদা চলমান অখন্ড ও নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কোন বিকল্প সমগ্র বিশ্বে এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। এই ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (remedial measures) জাতীয় সংসদের বিবেচনা (Discretion) অনুসারে লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কোন অজুহাতেই, এমনকি স্বল্পতম সময়ের জন্যও পরিহার করা যাইবে না। এমত অবস্থায় ঃ

(১) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের বিবেচনা (Discretion) অনুসারে, যুক্তিসঙ্গত কাল (reasonable period) পূর্বে, যথা, ৪২ (বেয়াল্লিশ) দিন পূর্বে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে, তবে, নির্বাচন পরবর্তী নূতন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করতঃ উক্ত সময়ের জন্য রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ও সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন;

(২) সাধারণ নির্বাচনের তপসীল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা (Discretion) অনুসারে যাহারা এমনকি পরোক্ষভাবে জড়িত, রাষ্ট্রের সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

বিজ্ঞ Amicus Curiae গণ সকলেই এই আদালতের সিনিয়র এ্যাড্ভোকেট। তাঁহাদের সুগভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ববোধ প্রশ্নাতীত। সংখ্যাগরিষ্ঠ Amicus Curiae গণ কোন না কোন আকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্হা বজায় রাখিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আশঙ্কা নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্হার অনুপস্থিতিতে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহারা সকলেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাঁহাদের আশঙ্কা আমরা একেবারে অবহেলা করিতে পারি না। যদিও তর্কিত সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬-কে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহা অবশ্যই অবৈধ। তবুও এইরূপ আশঙ্কার কারণে সহস্র বৎসরের পুরাতন Latin Maxim, যেমন, Id Quod Alias Non Est Licitum, Necessitas Licitum Facit (That which otherwise is not lawful, necessity makes lawful), Salus Populi Est Suprema Lex (Safety of the people is the supreme law) এবং Salus Republicae Est Suprema Lex (Safety of the State is the Supreme Law) ইহার সহায়তা লইতে হইল।

উপরোক্ত নীতিসমূহের আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্হা সাময়িকভাবে শুধুমাত্র পরবর্তী দুইটি সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে থাকিবে কি না সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র জনগণের প্রতিনিধি জাতীয় সংসদ লইতে পারে। উক্ত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকরূপে পালন করিতে সম্পূর্ণ সজাগ ও পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

এইরূপ অসাধারণ পরিস্হিতির কারণে উপরোক্ত সহস্র বৎসরের পুরাতন Latin Maxim প্রয়োগ করতঃ তর্কিত সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও আগামী দশম ও একাদশ সর্বোচ্চ এই দুইটি সাধারণ নির্বাচন জাতীয় সংসদের বিবেচনা অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্হার অধীনে হইতে পারে। তবে,

(১) জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্হায় বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণকে বাদ দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে, কারণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে তাহাদিগকে সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। বরঞ্চ,

(২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হইতে পারে, কারণ, জনগণের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, প্রজাতান্ত্রিকতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের basic structure এবং এই রায়ে উক্ত বিষয়গুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে;

(৩) উপরে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলেও বহাল থাকিবে। তবে শুধুমাত্র আইন দ্বারা কোন ব্যবস্থাই সকল সময়ের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র (Full proof) করা সম্ভব নয়। জনগণের সদা সর্বদা সচেতনতাই প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র আপীলে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬-এর আইনগত অবস্থান নিরূপণের প্রশ্নই শুধুমাত্র উত্থাপন করা হইয়াছে।

***

৪৪। সারমর্মঃ

(১) জনগণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মালিক, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, জনগণই একমাত্র সার্বভৌম;

(২) বাংলাদেশের সরকার মানুষের সরকার নহে, আইনের সরকার (Government of laws and not government of men);

(৩) সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন, ইহা বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান ও পদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রয়োজনীয়তায় ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে;



www.pathagar.com

(৪) জনগণের সার্বভৌমত্ব, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এবং সংবিধানের Basic structure;

(৫) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন ধরনের ছেদ (interruption) বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন করে না ;

(৬) সুপ্রীম কোর্ট ইহার Judicial Review এর ক্ষমতাবলে যে কোন অসাংবিধানিক আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে বা বাতিল (Strike off) করিতে পারে;

(৭) কোন মোকদ্দমার শুনানিকালে কোন আইনের সাংবিধানিকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সুপ্রীম কোর্ট সে সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না, আইনের প্রশ্নটি নিরসন করাই সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্ব;

(৮) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোন সংশোধন করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিন্তু রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ও সংবিধানের Basic structure ক্ষুণ্ন বা খর্ব বা সংশোধন করিতে পারে না;

(৯) সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন (amendment) করিয়াছে;

(১০) সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সংবিধানের Basic structure কে খর্ব করিয়াছে বিধায় উক্ত তর্কিত আইন অসাংবিধানিক ও অবৈধ, সুতরাং বাতিল হইবে;

(১১) বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ও কারণাধীনে কোন আইন ভাবীসাপেক্ষ ভাবে (Prospectivel) অবৈধ ঘোষণা বা বাতিল করা যাইতে পারে;

(১২) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের বিবেচনা (Discretion) অনুসারে, যুক্তিসঙ্গত কাল (reasonable period) পূর্বে, যথা,৪২ (বেয়াল্লিশ) দিন পূর্বে, সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে, তবে, নির্বাচন পরবর্তী নূতন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করতঃ উক্ত সময়ের জন্য রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ও সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন;

(১৩) সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, অসাংবিধানিক ও অবৈধ হইলেও জাতীয় সংসদ ইহার বিবেচনা (Discretion) সিদ্ধান্ত অনুসারে উপরে বর্ণিত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে দশম ও একাদশ সাধারণ নির্বাচনকালীন সময়ে প্রয়োজনমত নূতনভাবে ও আঙ্গিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(১৪) সাধারণ নির্বাচনের তপসীল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা (Discretion) অনুসারে এমনকি পরোক্ষভাবে জড়িত, রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে;

(১৫) বিদ্যমান সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদের শর্ত (Proviso) এর পরিবর্তে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদ গণতন্ত্রের স্বার্থে আনায়ন করা প্রয়োজন;

(১৬) ২০০৭ সালে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিন মেয়াদ পরবর্তী অতিরিক্ত প্রায় দুই বৎসর সময়কাল প্রশ্নবিদ্ধ বিধায় ঐ অতিরিক্ত সময়কালের কার্যাবলী মার্জনা (condone) করা হইল।

৪৫। আদেশঃ

অতএব, সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, ২০১১ সালের ১০ই মে তারিখ হইতে ভাবীসাপেক্ষ ভাবে (Prospectively) অসাংবিধানিক তথা অবৈধ ঘোষণা করা হইল এবং আপীলটি খরচা ব্যতিরেকে মঞ্জুর (allow) করা হইল। উপরোক্ত আপীলটিতে প্রদত্ত আদেশ Civil Petition For Leave to Appeal No.596 of ২০০৫ মোকাদ্দমায় অনুসরণ করা হইল।

ইহাছাড়াও, উপরে ৪৪ দফায় বর্ণিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হইল।

৪৬। মন্তব্য ঃ

এই রায়টি বিশেষ করিয়া আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় প্রদান করা হইল কারণ 'The judicial department comes home in its effects to every man's fire side' (John Marshall). এই প্রসঙ্গে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেটবৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া বিজ্ঞ Amicus Curiae গণকে তাঁহাদের গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন সহায়তার জন্য এই সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন (deep appeciaption) করিতেছে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের সহযোগী আইনজীবীকে টাঃ ২০,০০০/- করিয়া পারিতোষিক (honorarium) প্রদান করিবার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

সূত্র : সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট

বি:দ্রঃ এ মামলার রায়টি বাংলায় দেয়ায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা বানান সংশোধন করা হয়েছে।


www.pathagar.com

## ল' রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটি

২০১২-১৩

| | | |
|---|---|---|
| সালেহউদ্দিন<br>সভাপতি | সাঈদ আহমেদ<br>সহ-সভাপতি | মাশহুদুল হক<br>সাধারণ সম্পাদক |
| মো. জাহিদুল ইসলাম খান<br>যুগ্ম সম্পাদক | আজিজুল ইসলাম পান্নু<br>কোষাধ্যক্ষ | সাজেদুল হক<br>দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক |
| ইলিয়াস হোসেন<br>কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য | বিকাশ নারায়ণ দত্ত<br>কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য | নাজমুল আহসান রাজু<br>কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য |
| মুহাম্মদ ইয়াছিন<br>কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য | শামীমা আক্তার<br>কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য | |

## এল আর এফ-র সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

| মেয়াদকাল | সভাপতি | সাধারণ সম্পাদক |
|---|---|---|
| ২০০১-০২ | মনোজ কান্তি রায় (আহ্বায়ক) | কাজী আবদুল হান্নান (সদস্য সচিব) |
| ২০০২-০৪ | মনোজ কান্তি রায় | কাজী আবদুল হান্নান |
| ২০০৪-০৯ | ফারুক কাজী | আবদুর রহমান |
| ২০০৯-১১ | স্বপন দাশগুপ্ত | এম বদি-উজ-জামান |
| ২০১১-১২ | স্বপন দাশগুপ্ত | এম বদি-উজ-জামান |
| ২০১২-১৩ | সালেহউদ্দিন | মাশহুদুল হক |



www.pathagar.com

# সংবিধান ও বিচার বিভাগের ৪০ বছর

**প্রকাশনা :**
**ল' রিপোর্টার্স ফোরাম**
**১১৭, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি এনেক্স ভবন (নীচতলা)**

**সম্পাদনা পরিষদঃ**
**শহীদুজ্জামান**
**সালেহউদ্দিন**
**মাশহুদুল হক**
**ইলিয়াস হোসেন**
**সাজেদুল হক**

**প্রকাশকালঃ**
**মার্চ ২০১৩**

**শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদঃ**
**আজহার ফরহাদ**

**গ্রাফিক্স ও পৃষ্ঠাসজ্জাঃ**
**মোঃ সাকিল সরকার**

**মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা :**
**নন্দিত, ১০০-১১৯ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)**
**শাহবাগ ঢাকা ১০০০**
**ফোন : ৯৬৬০৯৭২, মোবাইল : ০১৭১১-০৫ ৩৩ ২৫**
**মূল্য : পাঁচ শত টাকা মাত্র**

www.pathagar.com